শ্রীঅরবিন্দ মন্দির পাঠমালা   অষ্টম, নবম ও দশম পাঠ

শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও বর্ত্তমান জগৎ

শ্রীঅনিলবরণ রায়
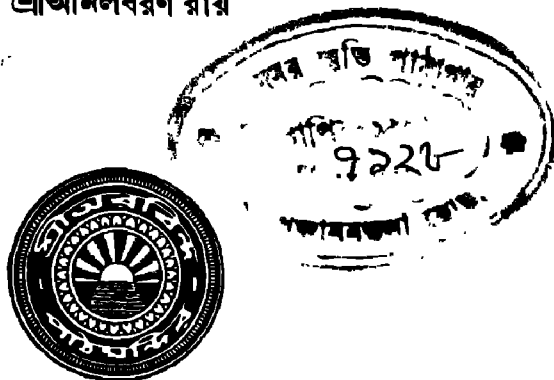
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫ কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা

বিষয় সূচী

"আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন সেই অপেক্ষায় থাকবো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে, শৃন্বন্তু বিশ্বে।"

—রবীন্দ্রনাথ

১

মা ভৈঃ

আজ আমাদের চতুর্দ্দিকে যে তাণ্ডবলীলা চলিতেছে, মানুষ জিঘাংসায় উন্মত্ত হইয়া নিরীহ শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক-কেও নৃশংস ভাবে হত্যা করিতেছে, ইহা দেখিয়া কেহ কেহ ভগবানের অস্তিত্বে পর্য্যন্ত সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছেন—দয়াময় সর্ব্বশক্তিমান ভগবান বলিয়া কেহ যদি থাকিতেন তাহা হইলে তিনি কি এই সব আসুরিক ও পৈশাচিক ব্যাপার ঘটিতে দিতেন ? কিন্তু এই সব নৃশংস ব্যাপার কিছুই নূতন নহে—পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ বহুবারই ঘটিয়াছে ; এই ভারতেরই বুকের উপর কতবার যে রক্ত-গঙ্গা বহিয়া গিয়াছে, কত তৈমুরলঙ্গ, নাদির শা, চেঙ্গীজ্ খাঁ শান্তিপ্রিয় ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসীর বাসভূমিকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে—তাহাতে যদি মানুষ ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস না হারাইয়া থাকে তবে আজই সেই বিশ্বাস হারাইবে কেন ?

তবে এটা ঠিক, মানুষ মনে করিয়াছিল যে ঐ-সব

নৃশংসতার যুগ চলিয়া গিয়াছে—সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে মানুষ অনেক অগ্রসর হইয়াছে, মানবদেহ ও মানবজীবনের পবিত্রতা সম্বন্ধে মানুষ অনেক সজাগ হইয়া উঠিয়াছে—মানুষে মানুষে সদ্ভাব, মৈত্রী, প্রেম এতখানি বর্দ্ধিত হইয়াছে, মানুষের হিংসা ও জিঘাংসা বৃত্তি কালক্রমে এতখানি প্রশমিত হইয়াছে যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সেই সব তাণ্ডবলীলা এখন আর সম্ভব নহে ; মানুষ ক্রমশঃই এমন উচ্চতর অবস্থার দিকে অগ্রসর হইয়াছে যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে চির-শান্তি স্থাপিত হইবে, সাম্য মৈত্রী, স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে—মানব-হৃদয়ের চির-দিনের এই স্বপ্ন অতঃপর বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে। সকল ক্ষেত্রে, সকল দিকেই এই শুভ পরিণতি ও পরিণামের লক্ষণ দেখা যাইতেছিল—জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি ও প্রসারে মানুষ এই পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য করিতে চাহিয়াছিল—সহসা কোথা হইতে কি-একটা আক্রমণ আসিয়া সব যেন লণ্ড ভণ্ড করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধেই এই লক্ষণ দেখা যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাজীদের আসুরিকতায় তাহা খুবই স্পষ্ট হইয়াছে এবং এখনও তাহারই জের চলিতেছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় না যে, ভগবান নাই—মানুষের মধ্যে যে-সব আসুরিক ও

পৈশাচিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে, ভগবানের কৃপাশক্তি যদি মানবজাতিকে পদে পদে রক্ষা না করিত—মানুষ বহুদিন পূর্ব্বেই আত্মঘাতী হইত, চিরতরে এই পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া যাইত। তাই বলিতেছি, এই সব নৃশংসতার দ্বারা ভগানের অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না, ইহা থাকা সত্ত্বেও মানুষ যে এতদিন বাঁচিয়া আছে, ক্রমশঃ উন্নততর সমাজের দিকে অগ্রসর হইয়াছে—ইহা হইতে ভগবানের অস্তিত্বের নিঃসংশয় প্রমাণই পাওয়া যায়। তবে সেই সঙ্গে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, যেমন ভগবান আছেন, তেমনি অসুরও আছে—আর পৃথিবীতে এবং মানবজীবনে এখন অসুরই রাজত্ব করিতেছে। সেখানে এখনও ভগবানের রাজ্য, প্রেমের রাজ্য, সত্য-শিব-সুন্দরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

সেই রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আবহমানকাল দেব ও অসুরের যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাই বর্ত্তমানে আবার উৎকট রূপ লইয়া দেখা দিয়াছে। পুরাণে দেব ও অসুরের সংগ্রামের বর্ণনা পাওয়া যায়—জগন্মাতা অসুরকে পরাজিত ও ধ্বংস করিয়া স্বর্গরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন; কিন্তু বস্তুতঃ ইহা এখনও সংঘটিত হয় নাই, ভবিষ্যতে যাহা হইবে পুরাণাদিতে রূপকচ্ছলে তাহারই আভাস দেওয়া হইয়াছে। প্রশ্ন উঠে, ভগবান যখন একমেবাদ্বিতীয়ম্—

তিনি ছাড়া কিছু বা কেহ আর কোথাও নাই, তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী, সচ্চিদানন্দ, তাহা হইলে অসুর কোথা হইতে আসিল—ভগবানকে বাধা দিবার শক্তি সে কোথা হইতে পাইল, আর মানুষকে নানারকম দুঃখ যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করিতেই বা তাহার এত উৎসাহ কেন? উল্লাস কেন? আর অসুর বা আসুরিক শক্তি যে আছে তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ ত কোথাও পাই না। দেখি, মানুষই অসুর হইতেছে—মানুষই মানুষের উপর নৃশংস অত্যাচার করিয়া পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করিতেছে। ইহার যদি প্রতিকার করিতে হয়, মানুষকেই শিক্ষিত করিতে হইবে, সংশোধিত করিতে হইবে, আইন কানুন পুলিশ প্রহরী প্রভৃতির দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। ইহার মধ্যে অসুর বা আসুরিক শক্তির কথা তুলিয়া মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ করা কেন?

ইহাই আধুনিক মনোভাব, আধুনিক মতবাদ। জড়দেহ ছাড়া অদৃশ্য কোন শক্তি থাকিতে পারে এবং সে শক্তি মানুষের জীবনের উপর এমন উৎকট প্রভাব বিস্তার করে বা করিতে পারে—আধুনিক মানুষ ইহা বিশ্বাস করিতে চাহে না। বৈজ্ঞানিক যুক্তি তর্কের সাহায্যেই সে মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান করিতে

চায়। মানবীয় শক্তির প্রয়োগেই সকল দুঃখ বিপদকে জয় করিতে চায়। কিন্তু এই মনোভাব হইতেছে অজ্ঞান-প্রসূত—বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্কের সাহায্যে জীবন সমস্যার সমাধান করিবার বিপুল প্রয়াস করিয়াও মানবজাতি আজ কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে? দৃষ্টিকে আরও প্রসারিত করিতে হইবে, জড়বিজ্ঞানের অতীত যে জ্ঞান আছে তাহা লাভ করিতে হইবে, মানবীয় শক্তির উর্দ্ধে যে-শক্তি আছে সজ্ঞানে তাহার সাহায্য লইতে হইবে, মানবজীবনের উপর যে-সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য শক্তি শুভ বা অশুভ প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহাদের সম্যক সন্ধান লইতে হইবে এবং তাহাদের সহিত যথোপযুক্ত ব্যবহার করিতে হইবে, শুভ শক্তিসকলকে সাদরে আহ্বান করিতে হইবে, অশুভ শক্তিসকলকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে, সংগ্রামে পরাজিত করিতে হইবে, তাহা হইলেই মানবজীবনের অতীব জটিল সমস্যা সমূহের প্রকৃত প্রতিবিধান হইতে পারে।

জগতে যে দেবশক্তি আছে, আসুরিক শক্তি আছে, মানুষকে লইয়া তাহাদের দ্বন্দ্ব চলিতেছে, সকল দেশের সকল ধর্ম্মেই যুগে যুগে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে—অতএব ইহার মূলে যে কিছু সত্য আছে তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া বর্ত্তমান যুগে যোগসাধনার দ্বারা

যাঁহাদের দিব্য দৃষ্টি হইতেছে তাঁহারাও এই সব শক্তির অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছেন। শ্রীঅরবিন্দ The Life Divine গ্রন্থে এই কথাই বলিয়াছেন—

"There are forces, and subliminal experience seems to show that there are supraphysical beings embodying these forces, that are attached in their root-nature to ignorance, to darkness of consciousness, to misuse of force, perversity of delight, to all the causes and consequences of the things that we call evil. These powers, beings or forces are active to impose their adverse constructions upon terrestrial creatures ; eager to maintain there reign in manifestation, they oppose the increase of light and truth and good and, still more, are antagonistic to the progress of the soul towards a divine consciousness and divine existence. It is this feature of existence that we see figured in the tradition of the conflict between the Powers of Light and Darkness, Good and Evil, Cosmic Harmony and Cosmic Anarchy, a tradition universal in ancient myth and in religion and common to all systems of occult knowledge. The theory of this traditional knowledge is perfectly rational and verifiable by inner experience, and it imposes itself if we admit the supraphysical and do not cabin

ourselves in the acceptation of material being as the only reality" (L. D. Vol II-468-69).

অর্থাৎ অধ্যাত্ম-দৃষ্টির দ্বারা এমন অনেক প্রাণীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহাদের স্থূল ভৌতিক শরীর নাই, অথচ তাহারা শক্তিমান। তাহাদের মূলগত প্রকৃতিতে তাহারা অজ্ঞান ও তমসাচ্ছন্ন চৈতন্যে আসক্ত; শক্তির অপব্যবহার করা, বিকৃত আনন্দ উপভোগ করা, সকল রকম অশুভ ও অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত হওয়াই তাহাদের স্বভাব। এই সকল অশুভ শক্তি, সত্তা, প্রাণী পৃথিবীর জীবসকলের উপর নিজেদের দুষ্কর্ম্ম চাপাইয়া দিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত; সৃষ্টির মধ্যে নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য তাহারা উদ্‌গ্রীব, সত্য, শিব ও সুন্দ-রের অভ্যুত্থানকে তাহারা সর্ব্বপ্রকারে বাধা দেয়, আর মানুষ যে একটা দিব্য-চৈতন্য, দিব্য-জীবনের দিকে অগ্রসর হইবে এটা তাহারা কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না, তাহাদের সকল শক্তি লইয়া ঐ অধ্যাত্ম প্রগতিতে বাধা প্রদান করে।

মানবজাতির এইরূপই এক দিব্য অধ্যাত্ম প্রগতি ও রূপান্তরের সন্ধিক্ষণ আসিয়াছে—ইহার প্রথম বাণী প্রচারিত হয়, যখন ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে শ্রীঅরবিন্দ Arya

পত্রিকার প্রারম্ভেই The Life Divine গ্রন্থের সূচনা করেন। ঐ সময় হইতেই দেখা যায়, আসুরিক শক্তি-সকল অতি উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীর উপর সব কিছু লণ্ডভণ্ড করিয়া দিবার প্রয়াস করিয়াছে—এবং এই ভাবেই অল্প সময়ের মধ্যে দুইটি মহাযুদ্ধ ঘটাইয়া এমন ধ্বংসলীলার অবতারণা করিয়াছে, মানুষের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। মধ্যযুগের পর হইতে মানুষ শান্তি শৃঙ্খলার দিকে, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার দিকে অনেকখানি অগ্রসর হইতে-ছিল, কার্য্যতঃ ততটা না হউক আদর্শ হিসাবেও মানুষ এই সকল মহান্ পরিকল্পনাকে গ্রহণ করিতেছিল এবং তাহার ফলে পার্থিব মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে যে অনেক উন্নতি হইয়াছে, ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য দেয়। অসুর ইহাতে তেমন বাধা দেয় নাই, কারণ মানুষের ঐ সব আদর্শ আদর্শ মাত্রই থাকিবে, কর্ম্মক্ষেত্রে সে-সব বিকৃত হইয়া যাইবে—যদি মানব-প্রকৃতির আমূল পরিবর্ত্তন না হয়। সেরূপ পরিবর্ত্তনের কোন সম্ভাবনা না থাকাতে অসুর পার্থিব মানবজীবনের উপর নিত্য আধিপত্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু এখন সে প্রমাদ গণিয়াছে—শ্রীঅরবিন্দ যে দিব্য-জীবন ও পূর্ণরূপান্তরের বাণী দিয়াছেন তাহাতে পার্থিব মানবজীবন হইতে অসুরের আধিপত্য সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত

হইবে, পৃথিবীতে জগন্মাতার রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। তাই অসুর তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া এই মহান যজ্ঞ পণ্ড করিয়া দিবার প্রয়াস করিতেছে।

অসুর আজিও সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয় নাই—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জগন্মাতার জয় অবশ্যম্ভাবী। অসুর হিট্‌-লারকে লইয়া যে প্রধান দুর্গ রচনা করিয়াছিল তাহা ধ্বংস হইয়াছে। ভারত স্বাধীন হইলেই তাহার অধ্যাত্ম প্রভাব বিস্তার করিয়া মানবজাতিকে প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণের পথ দেখাইয়া দিবে—এই জন্য অসুর ভারতের স্বাধীনতার পথে পর্ব্বত প্রমাণ বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল, সে সব বাধা আশ্চর্য্যভাবে আপনা আপনি সরিয়া যাইতেছে। অসুর বিক্ষিপ্তভাবে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নিজ প্রভাব রক্ষা করিবার শেষ প্রয়াস করিতেছে বটে, কিন্তু ইহা যে বস্তুতঃই শেষ প্রয়াস তাহা ক্রমশঃই পরিস্ফুট হইতেছে —জগন্মাতার শক্তি পূর্ণরূপে আত্মপ্রকট করিবার জন্য অন্তরালে প্রস্তুত হইতেছে। ধৈর্য্যের সহিত তাহার জন্য অপেক্ষা করা, এবং তাহার প্রকটনের পথে সকল বাধা বিঘ্ন অপসারিত করা—ইহাই হইতেছে যথার্থ সাধকোচিত মনোভাব।

সচ্চিদানন্দ সত্যময় প্রেমময় সর্ব্বশক্তিময় ভগবানের

সৃষ্ট জগতে অসুর কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিল, ভগবানের কার্য্যে বাধা দিবার শক্তিই বা কোথা হইতে পাইল—এ-সব প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উঠে। আমরা এখানে সে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না—শ্রীঅরবিন্দ The Life Divine গ্রন্থে এই চিরন্তন প্রশ্নের সম্যক উত্তর দিয়াছেন। তবে মোটামুটি একটি সহজ দৃষ্টান্তের দ্বারা এই সব অশুভ শক্তির উদ্ভবের কারণ বুঝান যাইতে পারে। কৃষক জমিতে ফসল উৎপন্ন করিবার জন্য ভাল করিয়া চাষ দেয়, সার দেয়, জল সেচন করে—তাহাতে যেমন ফসল উৎপন্ন হয় তেমনই আগাছাও উৎপন্ন হয়—এবং ঐ সকল আগাছা ফসলের বৃদ্ধির বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। আগাছা পুষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় জমিতে জল বা সার দেওয়া বন্ধ করিলে ফসলই হইবে না—অতএব কৃষক ঐ সব আগাছাকে কতকটা বৰ্দ্ধিত হইতে দেয়, তাহার পর যথাসময়ে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফসলকে রক্ষা করে। ব্যষ্টিগত আধারে সচ্চিদানন্দকে প্রকট করিবার জন্য ভগবান যখন নিজেই নিশ্চৈতন্যের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন —তখনই নানারকম অশুভ ও অন্ধকারের শক্তির আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী হইল। এই সকল শক্তিই ভগবানের কাজে বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারা শক্তি পাইয়াছে

ভগবানের নিকট হইতেই—কারণ শক্তির উৎস এক ভগবান ছাড়া আর কেহ কোথাও নাই; যাহারা সেই শক্তির সদ্ব্যবহার করিতেছে, ভগবানের কার্য্যে সহায় হইতেছে, তাহারাই দেবতা, এবং যাহারা সেই শক্তির অপব্যবহার করিতেছে তাহারাই অসুর। অসুর যে এত বলবান হইয়া উঠে—তাহার কারণ তাহার মধ্যে যে শক্তি রহিয়াছে তাহা ভগবানেরই শক্তি। অসুর হইতেছে বিকৃত দেবতা, fallen angel—তাই তাহাদের এত শক্তি ও প্রকোপ দেখা যায়। অসুর যে ভাগবত শক্তির অপব্যবহার করে তাহার মূল কারণ অজ্ঞানের প্রতি আসক্তি। সৃষ্টির অপরিহার্য্য প্রয়োজনে যখন অজ্ঞান ও নিশ্চৈতন্যের সৃষ্টি হইয়াছে—তখনই অসুরের সৃষ্টি হইয়াছে।

এখন ভগবানকে সেই সৃষ্টি-সমুদ্র-মন্থন হইতে উদ্ভূত অসুরের সহিত সংগ্রাম করিয়া নিজ সৃষ্টিকে রক্ষা করিতে হইতেছে। ভগবান হইতে লব্ধ শক্তির সদ্ব্যবহার বা অপব্যবহার করিয়া যেমন দেবতা ও অসুরের উদ্ভব হইয়াছে —মানুষের মধ্যেও তেমনই দেবভাবাপন্ন মানুষ এবং অসুরভাবাপন্ন মানুষ উৎপন্ন হইয়াছে; এই তত্ত্ব উপলক্ষ্য করিয়াই গীতা বলিয়াছে—দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ—"ইহলোকে দৈব এবং আসুর ভেদে

দ্বিবিধ জীব সৃষ্ট হইয়াছে।" অর্জ্জুন আশঙ্কা করিতেছিলেন যে, কুরুক্ষেত্রে ভীষণ ধ্বংস ও রক্তপাত করিলে তিনি অসুরে পরিণত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তুমি দৈবী সম্পদের অভিমুখী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব তোমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই।" যুদ্ধ, রক্তপাত, হত্যাকাণ্ড করিলেই যে তাহা পাপ হয়, আসুরিক হয়, তাহা নহে; দেখিতে হইবে কি উদ্দেশ্য লইয়া, অন্তরের মধ্যে কি ভাব লইয়া উহা করা হইতেছে। যাহারা দ্বেষ হিংসার বশে অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য যুদ্ধ করে, তাহারাই পাপী; হত্যাকাণ্ডে ও রক্তপাতে যাহারা বিকৃত আনন্দ উপভোগ করে তাহারাই অসুর বা আসুরিক মানব। কিন্তু যাহারা আত্মরক্ষার জন্য দুর্ব্বল, অত্যাচারিত, নিরীহ ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য কর্ত্তব্য হিসাবে যুদ্ধ করে তাহাদের ত কোন পাপই হয় না, সামর্থ্য থাকিতে যাহারা তাহা না করে তাহাদিগকেই ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয়, পাপের ভাগী হইতে হয়। গীতা বলিয়াছে, ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয় আর কিছুই নাই; যাহাদের প্রকৃতিতে যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য আছে, প্রবৃত্তি আছে তাহারাই ক্ষত্রিয় এবং তাহাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হইতেছে যুদ্ধ হইতে পলায়ন না করা। ইহার অর্থ নহে

যে, জগতে চিরকাল যুদ্ধ থাকিবে এবং ক্ষত্রিয়কে তাহার ধর্ম্মরূপে যুদ্ধ করিতেই হইবে। ভগবদ্‌কৃপায় পৃথিবীতে এমন দিন নিশ্চয় আসিবে যখন যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বন্দ্ব একেবারে উঠিয়া যাইবে, পৃথিবীর সকল মানব ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীর বন্ধনে বদ্ধ হইয়া এই পৃথিবীকেই স্বর্গ করিয়া তুলিবে। কিন্তু যতদিন অসুরের প্রভাব আছে এবং মানুষের মধ্যে দ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা, কাম, ক্রোধের প্রভুত্ব আছে, ততদিন অত্যাচারীর হস্ত হইতে আর্ত্তকে রক্ষা করিবার জন্য উদার ও মহৎ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম স্বীকার করিতেই হইবে। ভবিষ্যতে মানবজাতির কি অবস্থা হইবে সেই দিকে দৃষ্টি দিয়া গীতা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে নাই—পৃথিবীতে চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে ক্ষত্রিয়স্বভাবযুক্ত ব্যক্তিগণ শৌর্য্যবীর্য্য, সাহস, নেতৃত্বের অন্য ক্ষেত্র পাইবে; কিন্তু পৃথিবীতে মানবজাতির জীবন এখন যাহা, যেখানে দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার চলিতেছে, মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে অসুর তাহার প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে এবং নিজ আসুরিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য অজ্ঞান মোহগ্রস্ত মানুষকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেছে—এই অবস্থায় ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মকে সমাজে অতি উচ্চস্থান দিতেই হইবে এবং গীতা তাহাই করিয়াছে। ভগবান নিজেই ইহার দৃষ্টান্ত

সংশয়াকুল অর্জ্জুনের সম্মুখে ধরিয়াছেন—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

"সাধুগণের উদ্ধার ও পাপীসকলের বিনাশ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।"

গীতার এই সুবিখ্যাত বাক্য বেদেরই প্রতিধ্বনি। বিশ্বময়ী ভগবদ্‌শক্তি বলিতেছেন—

অহং রুদ্রায় ধনুরা তনোমি শরবে
ব্রহ্মদ্বিষে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ।

ঋগ্বেদ ১০।১২৫।৬

"যাহারা ভগবানের বিরোধী তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য আমি রুদ্রের ধনুতে জ্যা আরোপ করি। সাধুদের পরিত্রাণের জন্য আমি যুদ্ধ করি—আমি বিশ্বরূপা, স্বর্গ ও মর্ত্ত ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি।"

প্রশ্ন উঠে, ভগবান যদি সাধুদের রক্ষা করেন, দুষ্কৃতদের বিনাশ করেন, তাহা হইলে এত নিরীহ, নিরপরাধ স্ত্রী, শিশু, বৃদ্ধ এরূপ নৃশংসভাবে নিহত হইতেছে কেন?

দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, যুদ্ধে, দাঙ্গাহাঙ্গামায় ইহারাই ত দলে দলে কুকুর শিয়ালের মত মৃত্যুমুখে পতিত হয়! ভগবান কেন ইহাদের রক্ষা করেন না? কিন্তু এইরূপ প্রশ্ন হইতেছে মানুষের মানদণ্ড লইয়া ভগবানকে পরিমাপ করা —মানুষ যেটাকে সঙ্গত বলিয়া মনে করে ভগবান যেন সেইভাবে কর্ম্ম করিতে বাধ্য! ভগবানের কর্ম্মধারা ক্ষুদ্রবুদ্ধি অজ্ঞান অক্ষম মানুষের কর্ম্মধারা হইতে পৃথক— যাহারা ইহা বুঝে না, তাহারাই সংসারে দুঃখদৈন্যের তীব্র রূপ দেখিয়া ভগবানের অস্তিত্বে সন্দিহান হয়, অথবা তাঁহাকে বিচার করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করে। সৃষ্টি এক বিরাট বিশাল কর্ম্ম—ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া ইহা এক দিব্য লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে; এই প্রগতিকে ঠিক রাখিতে হইলে নিয়ম প্রয়োজন, শৃঙ্খলা প্রয়োজন,—যাঁহারা একটু গভীর ভাবে দৃষ্টিপাত করেন তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন এই জগৎ সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মের রাজ্য, এখানে কোথাও chance বা খেয়ালের স্থান নাই। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, যাহারা নিয়ম কানুন প্রণয়ন করে, আমি তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিয়মকর্ত্তা, যমঃ সংযমতামহম্, শাশ্বত ধর্ম্ম আমাতেই প্রতিষ্ঠিত, শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা। এই যে শাশ্বত নিয়মের দ্বারা সৃষ্টি পরিচালিত, জড়বিজ্ঞান

ইহারই বাহ্য আভাসকে Laws of Nature, প্রাকৃত নিয়ম বলিয়া আবিষ্কার করিতেছে। কর্ম্ম এইরূপই একটি নিয়ম, law—কর্ম্ম স্বভাবের বশেই নিজ ফল প্রদান করে. ইহা শুধু জড়-জগতেরই সত্য কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নহে, প্রাণ-জগতে এবং মানস-জগতেও ইহা সত্য। গীতা বলিয়াছে, সংসারে মানুষ কর্ম্মফল ভোগ করে, ভগবান তাহার যোগাযোগ করিয়া দেন না, স্বভাবের বশেই তাহা ঘটিয়া থাকে।

কর্ম্মফলে বিশ্বাস হিন্দুর মজ্জাগত। সংসারে কেহ দুঃখ কষ্ট পাইলে ভগবানকে তাহার জন্য দোষ না দিয়া হিন্দু নিজের অতীত কর্ম্মকেই দায়ী করে। কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায়, নির্দ্দোষী সাজা পাইতেছে, দোষীর কিছুই হইতেছে না—ইহাতে কর্ম্মের নিয়ম সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সংশয়ের জন্য কর্ম্মের নিয়ম দায়ী নহে, আমাদের অজ্ঞানই দায়ী, কর্ম্মের গতি অতিশয় জটিল, গহনা কর্ম্মণো গতি, মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধি তাহার গতি অবধারণ করিতে পারে না। মানুষকে যে শুধু নিজের ভালমন্দ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয় তাহাই নহে, অপরের ভালমন্দ কর্ম্মের ফলও তাহাকে অনেক সময় ভোগ করিতে হয়। এবং ইহাই স্বাভাবিক, কারণ মানুষ একেবারে

স্বতন্ত্র জীব নহে, নানা ভাবে সে অপরের সহিত জড়িত ; তাহা ছাড়া মূলে সকলেই এক, একই বহু হইয়া এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছে—অতএব এই জগতে একের কর্ম্মের ফল অপরে ভোগ করিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। আমাদের পুর্ব্বপুরুষরা যে-কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, আজও আমরা তাহার ফলভোগ করিতেছি। যে সমাজে আমি বাস করি, তাহাতে যদি দোষ থাকে, গ্লানি থাকে আমাকে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। আজ ভারতে হিন্দুমুসলমান বিরোধ যে উৎকট আকার ধারণ করিয়াছে--ইহার কারণ হিন্দুসমাজেরই নিজের উপর অত্যাচার। ভারতের মুসলমানরা অধিকাংশই ভারতের বাহির হইতে আইসে নাই—তাহারা হিন্দুরই বংশধর। প্রধানতঃ সমাজের অত্যাচারে, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার অত্যাচারে তাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে এবং আজও গ্রহণ করিতেছে।* এত দেখিয়া শুনিয়াও যদি হিন্দু-সমাজের চক্ষু উন্মীলিত না হয়, এই সকল সাংঘাতিক ব্যাধিকে পোষণ করা হয়,— তবে স্বভাবের নিয়মেই হিন্দু-সমাজ ধ্বংস হইবে—সেজন্য ভগবানকে দোষ দেওয়া বৃথা।

* কবি বড়ই দুঃখে বলিয়াছেন,—

"হিন্দুর দুর্গতি-মূলে দুর্ম্মতি হিন্দুর।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি মানুষের মধ্যে দুই প্রকার ভেদ আছে, দৈব ও আসুর, তবে সকল মানুষই যে এই দুইটির কোন একটি শ্রেণীতে পড়ে তাহা নহে। যাহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ খুব বর্দ্ধিত, তাহারাই দেবতুল্য, আর যাহাদের মধ্যে রজো-গুণ উৎকটভাবে প্রবল তাহারাই অসুরতুল্য—কিন্তু অধিকাংশ মানুষ হইতেছে এই দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি, দৈব ও আসুর ভাবের মিশ্রণ, কোনটিই তাহাদের মধ্যে প্রবল নহে। কোন শক্তিশালী ব্যক্তি আসিয়া তাহা-দিগকে একদিকে বা অন্যদিকে চালাইতে পারে। এই-খানেই আসে নেতৃত্বের দায়িত্ব। নেতার ভুল ভ্রান্তির ফল, কর্ম্মের ফল দেশের সকল লোককে ভুগিতে হয়—কোন দেশ যদি এমন সব লোককে নেতারূপে গ্রহণ করে যাহাদের সম্যক দৃষ্টি নাই, অথবা যাহাদের মধ্যে আসুরিক ভাবই প্রবল তাহা হইলে সেই নির্ব্বাচনের ফল তাহাদিগকে ভুগিতেই হইবে।

হিট্‌লার ছিল সাক্ষাৎ অসুরের অবতার, অথচ মোহের বশে জার্ম্মাণীর আবালবৃদ্ধবনিতা তাহাকেই একেবারে ভগবানের অবতাররূপে গ্রহণ করিয়াছিল, লক্ষকণ্ঠে তাহারই জয় গান করিয়াছিল—আজ তাহার ভীষণ ফল তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে। মানুষ যে এইরূপে

মোহান্ধ হইয়া অশুভকেই শুভ বলিয়া বরণ করিয়া লয় তাহার কারণ তাহার মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি রিপুর প্রভাব। মিত্রশক্তিপুঞ্জের প্রতি প্রতিহিংসার ভাব, ইহুদীদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ, জগতের উপর প্রভুত্ব করিবার উগ্র লোভ—এই সবকে প্রশ্রয় দিয়াই জার্ম্মাণ জাতি অসুরের কবলে পড়িয়াছিল। জগতে অসুর আছে বটে, কিন্তু দেবতাও আছেন, ভগবানও আছেন—সকল সময়ে সকলেই ভগবানকে আশ্রয় করিয়া অভয়ছায়া লাভ করিতে পারে। মানুষ যদি কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতির দ্বারা উত্তেজিত হয় তাহা হইলেই অসুর তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অধিকার করিয়া তাহার দ্বারা তাণ্ডব লীলার অবতারণা করিতে পারে, নচেৎ নহে। এই জন্যই গীতা কাম, ক্রোধ আর লোভ এই তিনটিকে বলিয়াছে নরকের দ্বার, সর্ব্বনাশের মূল কারণ। ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, সাম্প্রদায়িক লাভের জন্য, অথবা রাজনৈতিক কার্য্য উদ্ধারের জন্য অথবা অন্য কোন অজুহাতে যাহারা মানুষের মধ্যে ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসাকে জাগাইয়া তোলে তাহারাই মানবজাতির পরম শত্রু, তাহারাই পৃথিবীতে অসুরের সহায়, অসুরের রাজত্ব তাহারাই সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। মানবজাতির এমন অবস্থা ছিল—যখন

মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য ক্রোধ হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি আসুরিক প্রবৃত্তির সাহায্য লইতে হইত, কিন্তু তাহার বিষময় ফলও ভোগ করিতে হইত। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নাই, মানবজাতি শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতায় অনেক অগ্রসর হইয়াছে—পূর্ব্বকালে মানুষের উপর মানুষের যে অত্যাচার অতি সাধারণ ঘটনা ছিল, আজিকার সভ্য মানুষ এখন আর তাহা বরদাস্ত করিতে চাহে না। এখন মানুষের রজোগুণকে উত্তেজিত না করিয়া, তাহার সত্ত্বগুণকে যদি বর্দ্ধিত করা যায় তাহা হইলে সহৃদয়তা ও সদ্‌যুক্তির সাহায্যে মানবজীবনের সকল সমস্যারই সুমীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু সমাজে যাঁহারা নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারা এই সত্যটি এখনও অনুসরণ করিতেছেন না, মানুষের হৃদয়ে দ্বেষ হিংসার অগ্নি প্রজ্জলিত করাকেই তাঁহারা সহজ পন্থা বলিয়া অনুসরণ করিতেছেন। একটী দৃষ্টান্ত দিই। জগতের সর্ব্বত্র আজ ধনিক ও শ্রমিকে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে—এ-সমস্যা এমন কিছুই নহে যে যুক্তি ও আলোচনার সাহায্যে শান্তিপূর্ণ ভাবে ইহার মীমাংসা করা যায় না। শ্রমিক দেশের যে ধন উৎপাদনে সাহায্য করিতেছে সে জন্য তাহাকে ন্যায্য অংশ দিতে ধনিককে সম্মত করান কিছুই অসাধ্য ব্যাপার

নহে—অথচ এই যুক্তিসঙ্গত পন্থা বর্জ্জন করিয়া স্বয়ং-নির্ব্বাচিত শ্রমিক-নেতাগণ অজ্ঞান অশিক্ষিত শ্রমিকদের মধ্যে দ্বেষ হিংসার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতেছেন। বাংলাদেশে এই আন্দোলন কি ভাবে চলিতেছে, নিম্নলিখিত "শ্রমিকের গান" হইতেই পাঠকগণ তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইবেন—

জগতের মজুরেরা এক হও ভাই
আমরা যে দুনিয়াটা বদ্‌লাতে চাই।
ঠক্ ঠক্ হাতুড়ির শব্দ
নিশ্চল, ইতিহাস অব্দ,
চারিদিক স্তব্ধ
বণিকের ধনিকের বিশ্বটা জব্দ।
ধার দাও কাস্তে ও করাতে
গানে গানে সকলের জীবনটা ভরাতে।
হাপরের ভাঁজে ভাঁজে আগুনের নিশ্বাস,
আমাদের সব কাজে আগুনের আশ্বাস,
নূতন নূতন সুর আমাদের জাগলো,
আমাদের আকাশটা আগুন কি রাঙালো?
জগতের মজুরেরা আগুনের মন্ত্র,
নূতন নূতন সুরে মজুরের তন্ত্র।

যাঁহারা এই ভাবে অজ্ঞান শ্রমিকদের ক্ষেপাইয়া তুলিতেছেন

তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিতেছেন না যে এই ভাবে দেশের, জগতের, সমগ্র মানবজাতির কি সর্ব্বনাশ তাঁহারা সযত্নে গড়িয়া তুলিতেছেন। দুনিয়াটা বদলাইতেই হইবে —কিন্তু এই আগুন জ্বালানোর মন্ত্র এবং কাস্তে ও করাতে ধার দেওয়া, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিদ্বেষ, ঘৃণা, হিংসা জাগাইয়া তোলা, ইহাই কি তাহার পন্থা ? ইহার দ্বারা দুনিয়াটা ভালর দিকে বদলাইবে না, বহুদিনের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে মানুষ যে উন্নতস্তরে উঠিতেছিল—সেখানে হইতে পতিত হইয়া আবার সেই বর্ব্বরতার যুগেই ফিরিয়া যাইবে, পৃথিবীতে অসুরের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইবে। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নহে, সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক—সকল ক্ষেত্রেই ঐ একই রূপ আসুরিক প্রভাব—কাস্তে ও করাতে ধার দাও, আগুন জ্বালাও, লড়্‌কে লেঙ্গে পাকিস্থান ইত্যাদি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখিতে পাই আমাদের দেশে মেয়েরা পর্য্যন্ত আঙ্গুল কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া নেতাদের জন্য অভিনন্দন পত্র লিখিয়া দিতেছে—এবং নেতারা তাহা সগৌরবে গ্রহণ করিতেছেন! সর্ব্বত্র ঐ একই বাণী—রক্ত, আরও রক্ত! ফরাসী বিপ্লবের প্রতিধ্বনি, Blood, more blood! ইহাতে চারিদিকে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে এবং তাহাতে নিরীহ শিশু, বৃদ্ধ,

স্ত্রীলোকে পুড়িয়া মরিবে—সেজন্য ভগবানকে দোষ দেওয়া, দায়ী করা বৃথা।

জগতের বর্ত্তমান যে অবস্থা, যাহারা আত্মরক্ষার জন্য যথোচিত আয়োজন করিতে না পারিবে সেই অক্ষমতার ফলস্বরূপ তাহাদিগকে কুকুর শিয়ালের মতই মরিতে হইবে—কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের নীতি অতিশয় কঠোর, সে কাহারও মুখ চাহে না! তবে এই আত্মরক্ষার আয়োজন বলিতে শুধু শারীরিক বলের আয়োজনই বুঝায় না। শারীরিক বলের অপেক্ষাও উচ্চতর বল আছে, তাহা হইতেছে অধ্যাত্মশক্তি—ন চ দৈবাৎ পরং বলং। যাহারা ভগবানে বিশ্বাস করিবে, ভগবানের উপর নির্ভর করিবে, তাঁহার নিকট পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিবে—এই জগতের কিম্বা এই জগতের বাহিরের কোন শক্তি তাহাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না। গীতায় ভগবান প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন, কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি—"হে কৌন্তেয়! আমার যে ভক্ত সে কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, ইহা তুমি নিশ্চিতরূপে জানিও।" অজ্ঞান মানুষ ভগবানের এই মহান আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, তাই এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জগৎ সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মের

বশে চলিতেছে, আমরা সেই নিয়মের মর্ম্ম বুঝি না, তাই মূর্খের মত বলি, ভগবানের রাজ্যে ন্যায় নাই, বিচার নাই। কর্ম্মের নিয়ম অতি সূক্ষ্ম ও কঠোর। কিন্তু ভগবান এই নিয়মের উপরে—নিয়ম তাঁহারাই লীলা-প্রকাশের যন্ত্র, তিনি ইহার ব্যতিক্রম করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন এবং তাহাই ভগবদ্‌কৃপা। মানুষ যত বড় পাপী ও অপরাধী হউক না কেন, যদি একান্তভাবে ভগবানের শরণাগত হয়, ভগবানের কৃপা তাহাকে সকল কর্ম্মফলের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়, সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করে। ভগবানের কৃপা সকল সময়ে, সকল মানুষের উপরই কাজ করিতেছে—নতুবা ভগবান যদি শুধু পাপ-পুণ্যের বিচার করিয়া মানুষকে সাজা বা পুরস্কার দিতেন তাহা হইলে কঠোর বিচার হইতে কয়জন মুক্তি পাইত? সাধু অসাধু পাপী পুণ্যবান সকলকেই ভগবান কৃপা করিতেছেন—তবে যাহারা ভগবানের ভক্ত হয়, ভগবানের কৃপা আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করে তাহারা সেই কৃপা-শক্তির সাহায্য যেমন গ্রহণ করিতে পারে, অন্যে তাহা পারে না। কবি তাই বলিয়াছেন ঃ

তব প্রেম আঁখি সতত জাগে
জেনেও নাহি জানি।

তব মঙ্গলরূপ ভুলি তাই হে
শোকসাগরে নামি।

ভগবানের শরণাপন্ন হইলে মানুষ সকল বিপদ সকল দুঃখ হইতে রক্ষা পায়, দিব্য আনন্দময় জীবন লাভ করিতে পারে ; কিন্তু এমনই মানুষের অজ্ঞান যে আর সব কিছুতেই সে আস্থা স্থাপন করিতে পারে কেবল ভগবানের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারে না, ভগবানের দিকে ফিরিতে চাহে না। এইখানেই হইয়াছে অসুরের সর্ব্বাপেক্ষা বড় জয়—মানুষকে নানা কৌশলে ভগবদবিমুখী ভগবদবিরোধী করিয়া রাখিয়াছে, এবং এইভাবে মানবজীবনের উপর নিজ প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে।

ইহার যথার্থ প্রতিকার হইতেছে অধ্যাত্মভাবের এমন বহুল প্রচার যাহাতে মানুষের মন ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাহার কাম ক্রোধ লোভ দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি আসুরিক ও রাক্ষসী প্রবৃত্তিগুলি নির্ম্মূলিত হয়—তাহা হইলেই দুনিয়াটা প্রকৃতই বদলাইবে, এই পৃথিবীতে প্রেমের রাজ্য, স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। এবং সেই সঙ্গেই চাই ভগবদ্‌বিরোধী আসুরিক শক্তিসকলকে দমন করা। এই কার্য্য যোগীদের দ্বারাই সম্ভব, কারণ তাঁহারা যে গভীর অধ্যাত্মচৈতন্য লাভ করেন তাহার দ্বারাই এই

সব অসুরের ক্রিয়াকলাপ তাঁহারা সূক্ষ্মভাবে জানিতে পারেন এবং তদনুযায়ী তাহাদের প্রতিরোধ করিতে পারেন। মানবসমাজের মানবজাতির সমস্যাসকল এখন যেরূপ জটিল হইয়াছে, তাহাতে মানবীয় বুদ্ধির দ্বারা সে-সবের সমাধান আর সম্ভব নহে—চাই দিব্যবুদ্ধি, দিব্যদৃষ্টি এবং তাহা যোগ-সাধনার দ্বারাই লাভ করা যায়। ভারতই জগৎকে এই যোগ-সাধনার পথ দেখাইতে পারে ও দেখাইবে। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন—

"এখন সেই আদেশ আসিয়াছে। ভগবান সর্ব্বদা নিজের জন্য একটি দেশ নির্ব্বাচিত করিয়া রাখেন, সেই দেশে উচ্চতর জ্ঞানটি কতিপয় বা বহু লোকের দ্বারা সকল বিপদ আপদের ভিতর দিয়া রক্ষিত হয়, আর বর্ত্তমানে, অন্ততঃ এই চতুর্যুগে, ভারতই হইতেছে সেই দেশ। যখনই তাঁহার ইচ্ছা হয় যে, তিনি অজ্ঞানের রস পূর্ণভাবে আস্বাদন করিবেন, দ্বন্দ্বের রস, সংগ্রাম, ক্রোধ, নয়নজল, দুর্ব্বলতা, স্বার্থপরতা—এই সবের রস, তামসিক ও রাজসিক সুখের রস, এক কথায় কলির খেলার রস পূর্ণভাবে আস্বাদন করিবেন, তখনই তিনি ভারতে জ্ঞানকে নিষ্প্রভ করিয়া দেন এবং ভারতকে দুর্ব্বলতা ও অধঃপতনের মধ্যে নিক্ষেপ করেন যেন সে অন্তর্মুখী হইয়া নিজের

ভিতরে যায়, তাঁহার লীলার এই গতিতে বাধা প্রদান না করে। যখন তিনি এই কৰ্দ্দম হইতে উঠিতে চান, মানুষের মধ্যে নারায়ণকে পুনরায় শক্তিময় জ্ঞানময় আনন্দময় দেখিতে চান, তখন তিনি আবার ভারতের উপর জ্ঞান ঢালিয়া দেন এবং তাহাকে উত্তোলিত করেন যেন সে সমগ্র জগৎকে সেই জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ শক্তি, বিজ্ঞতা ও আনন্দ আনিয়া দিতে পারে। জ্ঞানের গতি যখন সংকুচিত হয়, ভারতের যোগিগণ সংসার ত্যাগ করিয়া নিজেদের ব্যক্তিগত মুক্তি ও আনন্দের জন্য অথবা কতিপয় শিষ্যের মুক্তির জন্য যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হন ; কিন্তু জ্ঞানের গতি আবার যখন প্রসারিত হয় এবং তাহার সহিত ভারতের আত্মা প্রসারিত হয় তখন তাঁহারা পুনরায় আবির্ভূত হন এবং সংসারের মধ্যে সংসারের জন্য কর্ম্ম করেন। জনক, অজাতশত্রু ও কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় যোগিগণ আবার পৃথিবীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া লোকসকলের উপর রাজত্ব করেন।”—যোগসাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য।

বিশ্ব-শান্তি

মহাযুদ্ধের অবসান হইয়াছে, কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যুদ্ধ কেহই চাহে না, অথচ বিশ্বের পরিস্থিতি এমন দেখা যাইতেছে যে, যে-কোন সময়ে আবার এক মহাযুদ্ধ বাধিতে পারে—সে-যুদ্ধে আণবিক বোমার ব্যবহার হইবে। সকল বিশেষজ্ঞেরই মত এই যে, এইরূপ যুদ্ধ বাধিলে কেহই রক্ষা পাইবে না, মানবীয় সভ্যতা, মানবজাতি সবই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

কিন্তু তাহাই যদি হয়, যুদ্ধ বাধিলে কেহই পরিত্রাণ না পায়, তাহা হইলে সকলেই আবার আত্মরক্ষার দোহাই দিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন কেন? আমেরিকানরা সংবাদ দিতেছেন যে, রুশিয়ার সৈন্য সংখ্যা এখন ৫০ লক্ষ, ইহার মধ্যে ২০ লক্ষ রহিয়াছে রুশিয়ার বাহিরে—জগতের নানা-স্থানে বিক্ষিপ্ত বা সন্নিবেশিত। আমেরিকার কত সৈন্য আছে, রুশিয়ার তরফ্ হইতে শীঘ্রই অবশ্য সংবাদ পাওয়া যাইবে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান রণসজ্জাও বড় কম হইবে

না। কিন্তু যুদ্ধ বাধিলে আর কাহারও পক্ষেই আত্মরক্ষা করা যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে এত সৈন্য পুষিবার, এত অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজন কি ? সার্থকতা কি ? যুদ্ধায়োজনের জন্য যে শ্রম ও অর্থ ব্যয়িত হইতেছে —তাহা যদি অন্ন বস্ত্র ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ব্যয়িত হয় তাহা হইলে পৃথিবী হইতে চিরতরে দারিদ্র্য দূর করা যায়—জীবনকে পূর্ণভাবে গঠন ও উপভোগ করিবার সুযোগ সকলকেই দেওয়া যায় এবং তাহা হইলে যুদ্ধ বিগ্রহের মূলই উচ্ছেদ করা হয়। অথচ এই সহজ বুদ্ধি মানবজাতির মস্তিষ্কে আসিতেছে না কেন ? ইহা কি ধ্বংসেরই পূর্ব্বলক্ষণ ? বস্তুতঃ পরিস্থিতি এখন এমন সঙ্গীণ হইয়াছে, মানুষ যদি অতঃপর সুবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত না হয় তাহা হইলে এ জাতির ধ্বংস স্বয়ং মহাদেবও ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবেন না। কিন্তু কে আজ মানবজাতিকে সুবুদ্ধি দিবে ? কোথায় সেই জগদ্-বরেণ্য নেতা যাঁহার বাণী অনুসরণ করিয়া মোহান্ধ মানুষ আজ প্রকৃত মুক্তির পথ দেখিতে পাইবে ?

পথ দেখাইবার লোকের অভাব নাই—কিন্তু এত লোকে এত পথ দেখাইতেছে যে দিশাহারা মানুষ যেন আরও দিশাহারা হইয়া পড়িতেছে। অনেকেই বলিতেছেন,

পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের একটি মাত্র পন্থা আছে, তাহা হইতেছে, সকল দেশ, সকল জাতিকে স্বাধীনতা দেওয়া এবং সকলের উপর এক বিশ্ব-রাষ্ট্র স্থাপন করা। প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেণ্ট বা রাষ্ট্র এখন যে-ভাবে আইন-কানুন করিয়া পুলিশের সাহায্যে সেই দেশের মধ্যে শান্তিরক্ষা করিতেছে —সমগ্র পৃথিবীর উপর সেইরূপ একটি রাষ্ট্র স্থাপন করিলে, দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান হইবে, পৃথিবীতে চির-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই সমাধানটি এতদিন সম্ভব ছিল না—কারণ পৃথিবী ছিল অতিশয় বৃহৎ—এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইতে অনেক সময় লাগিত—এরূপ অবস্থায় সমস্ত পৃথিবীকে এক-গবর্ণমেণ্টের শাসনে রাখা কার্য্যতঃ অসম্ভব ছিল বলিয়া এ-কথা কাহারও মনে উঠে নাই। কিন্তু বিজ্ঞানের কল্যাণে এই অসুবিধা এখন দূর হইয়াছে—তাই সমস্ত পৃথিবীকে এক-দেশ, এক-রাষ্ট্রে পরিণত করিবার আদর্শ সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইতেছে। এই আদর্শ প্রচারের জন্য আজ পৃথিবীতে যে কত সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে, কত লোক ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত-ভাবে এ-জন্য চেষ্টা করিতেছে, কত প্রবন্ধ, কত পুস্তক লিখিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই, আর বোধ হয় এ-বিষয়ে আমেরিকার জনসাধারণই আর সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু কোনও দেশের গবর্ণমেন্টই এই আদর্শ গ্রহণ করিতেছে না, আমেরিকা ত নহেই। এক-রাষ্ট্র স্থাপন করিলেই যদি পৃথিবী হইতে যুদ্ধ-বিগ্রহ উঠিয়া যায় তাহা হইলে সকল দেশের গবর্ণমেন্ট এই আদর্শ এখনই গ্রহণ করিয়া ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইতেছে না কেন? সাধারণতঃ ইহার দুইটি কারণ নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে। প্রথম, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আজ যাহারা নেতৃত্ব করিতেছেন, তাহারা কোন রকমে কলে-কৌশলে ক্ষমতা ও প্রভুত্ব পাইয়াছেন বটে কিন্তু তাহাদের বুদ্ধি অতিশয় স্থূল, বিশ্বশান্তির এই সহজ পন্থাটি দেখিতে না পাইয়া, তাহারা শুধু যুদ্ধ সম্ভারই বৃদ্ধি করিতেছেন আর জগতের সর্ব্বত্র ঘাঁটি আগলাইবার জন্য পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছেন। ইহাতে রুশিয়া সন্দেহ করিতেছে আমেরিকা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে, আমেরিকাও রুশিয়াকে সেইরূপ সন্দেহ করিতেছে—এই সন্দেহই ক্রমে গভীর বিদ্বেষ ও যুদ্ধে পরিণত হইতে বাধ্য—তখন জগতের আর-সকল দেশ ও জাতি এক পক্ষে না হয় আর-এক পক্ষে আসিয়া দাঁড়াইবে। নেতাদের ঘটে যদি বুদ্ধি আসে, সকলেই যদি সৈন্য-সামন্তকে গৃহে পাঠাইয়া দিয়া এবং যুদ্ধের জাহাজ-

গুলিকে জলে ডুবাইয়া দিয়া এক-বিশ্বরাষ্ট্র গঠন করিতে উদ্যোগী হন—তাহা হইলে কে কাহাকে সন্দেহ করিবে, ভয় করিবে ?

সকলে সৈন্য উঠাইয়া দিলে যুদ্ধ অসম্ভব হইবে বটে —কিন্তু এক দেশ যদি ইহা করে আর অন্য দেশ না করে তখন ঐ নিরস্ত্র দেশের উপায় কি হইবে ? বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কোন দেশ অন্য কোন দেশকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না—শুধু প্রবন্ধ লিখিয়া বা বক্তৃতা দিয়া এই অবিশ্বাস ও ভয় দূর হইবে না—অতএব সাধ্যমত সকলেই আত্মরক্ষার আয়োজন করিবে। আর প্রত্যেক দেশের যদি নিজ নিজ সৈন্য-সামন্ত থাকে তাহা হইলে এক-বিশ্বরাষ্ট্র হইতেই পারে না। এক দেশের মধ্যে যেমন গবর্ণমেণ্টেরই অধীনে সেনা থাকে, কোন ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা প্রদেশকে স্বতন্ত্রভাবে সেনা রাখিতে দিলে কোন গবর্ণমেণ্টই টিকিতে পারে না—তেমনই বিভিন্ন দেশকে আপন আপন সেনা রাখিতে দিলে এক-বিশ্বরাষ্ট্র চলিবে না। অতএব, এটা নেতাদের বুদ্ধির অভাবের জন্য যে হইতেছে না তাহা নহে—অথবা যুদ্ধটাই তাঁহারা ভালবাসেন তাহাও নহে—কিন্তু মানবজাতির বর্ত্তমান মানসিক অবস্থায় ইহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব নহে।

আদর্শ হিসাবে বিশ্বরাষ্ট্র-গঠন প্রচারিত হউক, মানুষের মন তাহার জন্য তৈয়ারী হইয়া উঠুক—কিন্তু এখন বিশ্বে শান্তি রক্ষার অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। মিলিত জাতি সঙ্ঘ United Nations Organisation হইতে সেই চেষ্টাই করা হইতেছে—উহার দ্বারা কিছু হইবে না বলিয়া উহাকে নিন্দা করিয়া কোন লাভ নাই, উহার সফলতার পথে অন্তরায়গুলি যাহাতে দূর হয় সেই চেষ্টা করাই সকলের কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমানে তিনটি দেশ পৃথিবীর মধ্যে প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমেরিকা, রুশিয়া ও ব্রিটেন—ইহারা যদি একমত হইয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে ইহাদের মিলিত শক্তিতে জগতে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে—বর্ত্তমান রাজনৈতিক নেতাগণ সেই চেষ্টাই করিতেছেন। ইহাকে power politics বলিয়া যাঁহারা নিন্দা করিবেন বাস্তব জগতের সহিত তাঁহাদের পরিচয় নাই ইহাই বলিতে হইবে। Power politics, প্রভুত্ব শক্তি—এ-সব হইতেছে বাস্তব তথ্য। কোন দেশেই একেবারে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—প্রথমে স্বৈর-রাজতন্ত্র নিরঙ্কুশ রাজশক্তি প্রয়োগে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছে, তাহার পর ক্রমশঃ প্রজারা রাজশক্তিকে

নিজেদের অধীন করিয়া স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। দেশে দেশে যেমন হইয়াছে—বিশ্বরাষ্ট্রও সেইভাবেই গড়িয়া উঠিবে। কোন এক দেশ যদি সমগ্র পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করে তাহা হইলে এখনই যুদ্ধবিগ্রহ উঠিয়া যায়, শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে এরূপ চেষ্টা যে হয় নাই তাহা নহে—আমাদের যুগে জার্ম্মাণী ও জাপান সে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোন একটি দেশের পক্ষে সমগ্র জগতের উপর রাজত্ব করা সম্ভব নহে। তবে কয়েকটি দেশ মিলিয়া তাহা করিতে পারে—বর্ত্তমানে Big Three, সেইরূপ সমাধানেরই প্রয়াস।

কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে এই যে, এই তিনটি প্রধান শক্তির মধ্যে মিল হইতেছে না। ব্রিটেনকে আমেরিকার সহিত ধরিলে বলা যায় বর্ত্তমান জগতে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি, আমেরিকা ও রুশিয়া, ইহারা মিলিত হইতে পরিলে জগতে শান্তি হইবে, নতুবা যুদ্ধ অনিবার্য্য। কাজেই দুই পক্ষ যুদ্ধের জন্য সর্ব্বরকমে প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি এর পর এই যুদ্ধ বাধিলে, সবই ধ্বংস হইয়া যাইবে—তখন আর শান্তি স্থাপনের প্রশ্নই থাকিবে না। অতএব আমেরিকা ও রুশিয়া সহজে যুদ্ধে নামিবে না—

ইত্যবসরে যদি একটা মীমাংসা হইয়া যায় তাহা হইলেই জগতের পক্ষে কল্যাণ।

কিন্তু রুশিয়া ও আমেরিকায় ঠিক বিরোধ কোন খানে? ইহা সাম্রাজ্যবাদের বিরোধ নহে—ইহা হইতেছে আদর্শের বিরোধ। স্থূলভাবে ইহাকে বলা যায় Capitalism এবং Socialism-এর বিরোধ, কিন্তু বস্তুতঃ এই বিরোধ এখন আর তেমন উগ্র নাই। Socialism বা Communism বলিতে যদি বুঝায় এক শ্রেণী কর্ত্তৃক অন্য শ্রেণীর শোষণ নিবারণ—এ বিষয়ে আমেরিকা ও রুশিয়ায় বেশী তফাৎ নাই, আমেরিকার শ্রমিকরা সেখানকার ধনিকদের সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া নিজ নিজ প্রাপ্য বেশ আদায় করিয়া লইতেছে। Capitalist-দেশে শ্রমিকদের অবস্থা রুশিয়ার শ্রমিকদের অবস্থা হইতে কোন রকমে খারাপ নহে। রুশিয়াতেও যে Socialism বা Communism স্থাপিত হইয়াছে—তাহা মার্ক্‌স বা লেনিনের আদর্শ অনুযায়ী নহে। বাস্তব পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, মার্ক্‌সের দৃষ্টিতে অনেক ভুল ছিল এবং তাহার আদর্শ-অনুযায়ী সমাজতন্ত্র গঠন করা কার্য্যতঃ সম্ভব নহে। তাই বর্ত্তমান রুশিয়ার অনেক ব্যবস্থাই ক্যাপিটালিষ্ট দেশের অনুরূপ। দ্বন্দ্ব ঠিক এইখানে নহে।

ব্রিটেনে গবর্ণমেণ্ট সোস্যালিষ্ট—কিন্তু রুশিয়া ব্রিটেনকে আমেরিকার সামিল বলিয়া ধরিয়াছে। প্রকৃত দ্বন্দ্ব হইতেছে ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক লইয়া। ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র, না, রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি? মানুষ বর্ত্তমানে যে মানসিক চৈতন্যের মধ্যে রহিয়াছে তাহাতে এই প্রশ্নের চরম মীমাংসা হইতে পারে না—কেহ একমতের দিকে ঝুঁকিবে, কেহ অন্য মতের দিকে ঝুঁকিবে এবং এইভাবে দ্বন্দ্ব চলিতেই থাকিবে, পৃথিবীর শান্তিও বিপর্য্যস্ত হইবে। আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স বলিতেছে—তাহাদের দেশেই প্রকৃত ডেমক্রেসি। রুশিয়া বলিতেছে ডেমক্রেসির প্রকৃত রূপ তাহারাই দেখাইতেছে—ফ্রান্স প্রভৃতির ডেমক্রেসি হইতেছে "Old-fashioned democracis behind the time." হিট্‌লারও ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন।

ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সত্য সম্বন্ধটি স্থাপন করিতে হইলে মানুষকে এক উর্দ্ধতর চৈতন্যের মধ্যে উঠিতে হইবে। মানুষের চৈতন্যের যে এরূপ বিকাশ হইতে পারে, তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে তাহা যাহারা বিশ্বাস করেন না—তাহারাই আজ বিশ্বরাষ্ট্র স্থাপনকেই একমাত্র সামাধান বলিয়া প্রচার করিতেছেন। শান্তিভঙ্গ করিলে শাস্তি পাইতে হইবে এই ভয়ে মানুষ

শান্তি রক্ষা করিবে—কিন্তু বলা বাহুল্য ইহাকে মানবজাতি, মানব সভ্যতার খুব উচ্চ অবস্থা বলা যায় না। আদর্শ হইতেছে পারিবারিক জীবন—সেখানে শান্তি শৃঙ্খলা থাকে ভয়ে নহে, শাসনে নহে, আইনকানুনের দ্বারা নহে, সেখানে শান্তি শৃঙ্খলার ভিত্তি হইতেছে, স্নেহ, ভক্তি, প্রেম। সমস্ত মানবজাতি যখন এইরূপ এক-পরিবারে পরিণত হইবে তখনই সকল দ্বন্দ্বের অবসান হইবে—এবং সেজন্য চাই মানব-প্রকৃতির আমূল রূপান্তর। মার্ক্‌সের দৃষ্টিতে আর যত ভুলই থাকুক, তিনি মানব-প্রকৃতির এই রূপান্তরে বিশ্বাসবান ছিলেন। তিনি যে আদর্শ সমাজের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাতে রাষ্ট্র থাকিবে না, আইন-কানুন থাকিবে না, সকলে পরস্পরের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া বাস করিবে, মানব-প্রকৃতি হইতে দ্বন্দ্ব ও বিরোধের মূল উৎপাটিত হইবে। ইহা সত্য দৃষ্টি। কিন্তু কি উপায়ে এই রূপান্তর আসিবে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে গিয়াই তিনি ভুল করিয়াছিলেন। তাঁহার ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষা তাঁহাকে বহির্মুখী করিয়াছিল, অন্তর্মুখী হইতে দেয় নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন বর্ত্তমানে সমাজের যে বাহ্য পরিস্থিতি, ইহার আমূল পরিবর্ত্তন করিলেই, মানব-প্রকৃতির আমূল

পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে। আর সমাজে শ্রমিকদের প্রাধান্য স্থাপনকেই তিনি সেই আমূল পরিবর্ত্তন বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। রুশিয়ার পঁচিশ বৎসরের পরীক্ষায়—মার্ক্‌সের এই নব নীতির ভুল প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। মানুষের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে কেবল অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারা। এখন মানুষের জীবনের কেন্দ্র হইতেছে "অহং"—এই অহংজ্ঞানের বশে সে নিজেকে জগতের আর সব কিছু হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে এবং আর সব কিছুকেই অহংয়ের তৃপ্তি ও বৃদ্ধির কাজে লাগাইতে চায়—যাহার সহিত "আমি"র সম্বন্ধ আছে, আমার সম্প্রদায়, আমার দেশ, আমার জাতি, সে-সবের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য মানুষ জগতের আর সকলের সহিতই দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়। মানব-ব্যক্তিত্বের ও সমাজের বিকাশে এই অহংবোধ বিশেষ সহায়তা করিয়াছে—কিন্তু এখন উন্নততর জীবন লাভ করিতে হইলে তাহাকে এই অহংবোধ অজ্ঞান বলিয়া বুঝিতে হইবে। আমাদের দেহ, প্রাণ, মনকেই আমাদের প্রকৃত সত্তা বলিয়া যে বোধ—এইটিই অহং, ইহা অজ্ঞান এবং এই অজ্ঞানই সংসারের যত দুঃখ, দ্বন্দ্ব ও পাপের মূল। দেহ প্রাণ মনের পশ্চাতে আমাদের যে আত্মা রহিয়াছে তাহাই

আমাদের প্রকৃত সত্তা, তাহাতে আমরা ভগবানের সহিত এক, সর্ব্বভূতের সহিত এক। মানুষ যখন ক্ষুদ্র অহংভাব ছাড়াইয়া সেই আত্ম-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে তখনই মানবসমাজে প্রকৃত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। অতএব ক্যাপিটালিজ্‌ম্ সোস্যালিজ্‌ম্ প্রভৃতি লইয়া বৃথা দ্বন্দ্ব না করিয়া—যে-দেশ যে-ভাবে তাহার রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক জীবন গঠন করিতে চায়, তাহাকে তাহা করিতেই স্বাধীনতা দেওয়া হউক, আমার মতটিই একমাত্র সত্য, সকলের উপর জোর করিয়া ইহা চালাইবার আমার অধিকার আছে—এই মারাত্মক মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্র ঐক্য, সামঞ্জস্য, সহযোগ স্থাপনের যথাসাধ্য প্রয়াস করা হউক, ইতিমধ্যে সর্ব্বত্র মানুষ যাহাতে অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারা নিজের আত্মাকে জানিতে পারে, ভগবানের সহিত সাক্ষাৎভাবে যুক্ত হইয়া দেহ, প্রাণ মনের দিব্য রূপান্তর সাধন করিতে পারে সকলকে সেই সুযোগ দেওয়া হউক—ইহা ছাড়া আর অন্য কোন পথই নাই।

শ্রীঅরবিন্দ কি করিতেছেন

এতদিন অনেকেরই মনে এই ধারণা ছিল যে, শ্রীঅরবিন্দ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া তাঁহার নির্জ্জনবাসে যে যোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত রহিয়াছেন তাহাতে তিনি নিজে মুক্তি বা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা দুঃস্থ দেশের বা জগতের কোন কাজেই লাগিবে না—রবীন্দ্রনাথ যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন,

হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু ! স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্ত্তি তুমি, —দেশ তাঁহাকে বুঝি চিরদিনের জন্য হারাইয়াছে ! কিন্তু এখন লোকের এই ধারণার অনেক পরিবর্ত্তন হইতেছে বলিয়া মনে হয়—অনেকেই উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, শ্রীঅরবিন্দ সুদীর্ঘকাল অপূর্ব্ব নিষ্ঠার সহিত যে মহান সাধনায় প্রবৃত্ত আছেন তাহা শুধুই তাঁহার নিজের বা কতিপয় শিষ্যের আত্মার কল্যাণের জন্য নহে, এমন কি শুধুই ভারতের জন্যও নহে, পরন্তু সমগ্র জগৎ, সমগ্র মানবজাতির জন্য। কিন্তু ঠিক কি ভাবে শ্রীঅরবিন্দের যোগ বর্ত্তমান জগতের ব্যবহারিক জীবনকে প্রভাবান্বিত করিবে তাহা তাঁহারা এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, শ্রীঅরবিন্দের যোগ কিছু একটা একেবারে নূতন জিনিষ নহে—ভারতে স্মরণাতীত কাল হইতে যে যোগসাধনা চলিয়া আসিতেছে—ইহা মূলতঃ তাহাই। তবে কালক্রমে এই সাধনার গতি মন্দীভূত হইয়া পড়িলে তাহাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করিতে হয়। অর্জ্জুনকে গীতার যোগ শিক্ষা দিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, তিনি নূতন কিছু শিক্ষা দিতেছেন না—"এই অব্যয় অবিনশ্বর ফলপ্রদ যোগ বলবান কালবশে এইক্ষণে জগতে বিলুপ্ত হইয়াছে—সেই পুরাতন যোগ আমি আজ তোমাকে বলিলাম, ইহা উত্তম রহস্যময়" (৪।১-৩)। শ্রীঅর-বিন্দের যোগ সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা চলে—পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে লোকে আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস হারাইয়া-ছিল—যাহারা সে বিশ্বাস হারায় নাই তাহারাও যোগ-সাধনা সম্বন্ধে নানা সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত ধারণা পোষণ করিতে-ছিল—শ্রীঅরবিন্দ অপূর্ব্ব সাধনার কল্যাণে সেই প্রাচীন যোগকেই উজ্জ্বল করিয়া, বর্ত্তমান যুগের উপযোগী রূপ দিয়া জগৎবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। গীতার যুগে যোগসাধনায় যে সঙ্কীর্ণতা আসিয়াছিল—বর্ত্তমানে কতকটা তাহারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। তখন এই ধারণা খুবই

প্রবল হইতেছিল যে যোগের সহিত ব্যবহারিক জীবনের, আধ্যাত্মিকতার সহিত সাংসারিক কর্ম্মের কোন সমন্বয় হইতে পারে না—সেই শিক্ষার প্রভাবেই অর্জ্জুন তাঁহার ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুক হইতে চাহিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের এই সমস্যাকে লক্ষ্য করিয়াই সমগ্র গীতার শিক্ষা কথিত হইয়াছে—বেদ ও উপনিষদের সার সংগ্রহ করিয়া দেখান হইয়াছে যে, যোগের সহিত সাংসারিক কর্ম্মের কোনই বিরোধ নাই, পরন্তু যোগই হইতেছে কর্ম্মের প্রকৃত কৌশল, যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্, যোগসাধনার দ্বারাই আমাদের স্বাভাবিক শক্তি-সকল তাহাদের পূর্ণতা ও উচ্চতম নিপুণতা লাভ করিতে পারে! শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পরমতম অধ্যাত্মজ্ঞান শিক্ষা দিয়া সংসারত্যাগ করিতে বলেন নাই, বলিলেন,—

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।

"তোমার অবসাদ বর্জ্জন করিয়া যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান হও, যশ লাভ কর, শত্রুগণকে জয় করিয়া সমৃদ্ধিশালী রাজ্য উপভোগ কর।"

কিন্তু গীতার এই শিক্ষা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল বন্যায় ভারতবাসীর জীবনে যথাযথ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে

নাই, পরে শঙ্কর গীতার যে মায়াবাদমূলক ভাষ্য প্রণয়ন করিলেন তাহাতে গীতা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরই শাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। মায়াবাদের মধ্যেও পরম সত্য রহিয়াছে —এই সংসার যে দুঃখময় অনিত্য, এখানে আসিয়া আত্মার সন্ধান করা, ভগবানের ভজনা করাই যে মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য গীতায় ভগবান তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন (৯।৩৩), কিন্তু শঙ্করের ন্যায় গীতা এই দুঃখময় সংসারকে ত্যাগ করিতে বলে নাই, সাধনার দ্বারা ভগবানকে লাভ করিয়া, দুঃখের সহিত সকল সংযোগের বিয়োগ ঘটাইয়া (৬।২৩) সংসারেই থাকিতে বলিয়াছে, সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম করিতে বলিয়াছে, সর্ব্বকর্ম্মাণি। ভগবানকে অস্বীকার করিয়া, আত্মার সন্ধান না করিয়া সাংসারিক জীবন যাপন করিতে যাইলে তাহার কি ভীষণ পরিণাম হয়, জড়বাদী ইউরোপ তাহার প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, আর মায়াবাদের প্রচার করিয়া লোকসকলকে সংসারে বিমুখ, কর্ম্মবিমুখ করিলে কি বিষময় ফল হয়, ব্যবহারিক জীবনে ভারতের চূড়ান্ত অধঃপতনই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মানবজাতিকে যদি রক্ষা পাইতে হয়, আবার সেই গীতার সত্য আদর্শে ফিরিয়া যাইতেই হইবে—ভিতরে অধ্যাত্ম চৈতন্যে, ভাগবত চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দিব্য ভাবে

বাহিরের সাংসারিক জীবনকে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগের লক্ষ্য দিব্যজীবন, The Life Divine.

তবে গীতার শিক্ষার অনুসরণ অমনি মুখের কথাতেই হয় না। এই ভারতবর্ষে ধার্ম্মিক লোকের অভাব নাই—নিয়মিত গঙ্গাস্নান, পূজা, আহ্নিক, উপাসনা অনেকেই করিয়া থাকেন, মুসলমানেরাও মসজিদে প্রত্যহ সাতবার নমাজ পড়েন, খ্রীষ্টানরা গির্জ্জায় যান। ইহাতে লাভ যে কিছু হয় না তাহা বলি না, আর সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু করা সম্ভবও নহে—তবে গীতা যে আধ্যাত্মিকতার সহিত জীবনের সমন্বয়কেই মানব-জীবনের আদর্শ বলিয়াছে, এইভাবে তাহা সিদ্ধ করা যায় না। ভগবানকে লাভ করিতে হইলে আর সব কিছু ছাড়িয়া তাঁহার ভজনা করিতে হইবে, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য—পরিবার, দেশ, সমাজ সব কিছু নির্ম্মম ভাবে বর্জ্জন করিয়া একমাত্র ভগবানের সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। কারণ অহংই হইতেছে সংসারের সকল দুঃখ ও দ্বন্দ্বের মূল, "আমার" পরিবার বর্গ, "আমার" দেশ, "আমার" সম্প্রদায়, এই ভাব লইয়া কাজ করিতে গেলে অহংভাবই তীব্র হইয়া উঠে এবং তাহার ফলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে,

দেশে দেশে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। এই অহংভাবের বশে আমরা নিজদিগকে সংসারের আর সকল হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করি—ইহাই অজ্ঞান, অবিদ্যা। প্রকৃত জ্ঞান হইতেছে এই যে, মূল সত্তায় আমরা ভগবানের সহিত এক, সর্ব্বজীবের সহিত এক, সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা। মানুষ যখন অহংভাব ছাড়াইয়া এই আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবে তখনই মানব-সমাজে প্রকৃত সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হইবে —মানুষের ভিতরকে ঠিক না করিয়া বাহিরকে ঠিক করিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। যোগী ঋষির দেশ ভারতবর্ষই জগৎকে এই শিক্ষা দিতে পারে ও দিবে, আর এই লক্ষ্যের দিকেই শ্রীঅরবিন্দের সকল কর্ম্ম ও সাধনা পরিচালিত হইয়াছে।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে কেমন করিয়া দ্রুত অধ্যাত্ম চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে তাহারই সাধনা চলিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা মূলতঃ গীতারই আদর্শ, গীতারই সাধনা। কিন্তু গীতার সাধনার লক্ষ্য হইতেছে ব্যক্তিবিশেষের মুক্তি ও সিদ্ধি—সমগ্র মানবজাতি অধ্যাত্ম চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে, গীতার যুগে এ আশা সুদূরপরাহত ছিল, তাই গীতা স্পষ্টতঃ

তাহা প্রচার করে নাই। শ্রীঅরবিন্দ দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন যে, ক্রমবিবর্ত্তনের ধারায় মানবজাতি এমন স্তরে উপনীত হইতেছে যেখানে অধ্যাত্মজীবন লাভ করিতে মানুষকে আর পূর্ব্বের মত বেগ পাইতে হইবে না। শ্রীরামকৃষ্ণও এইরূপ ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়াছেন যে, ঊর্দ্ধ হইতে পৃথিবীতে এক ভাগবত শক্তির অবতরণের ফলেই মানবজাতির ঊর্দ্ধতর বিবর্ত্তন সংসিদ্ধ হইবে। সেই শক্তির অবতরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই হইতেছে শ্রীঅরবিন্দের জীবন-ব্রত। সেই শক্তি অবতীর্ণ হইবামাত্রই যে সমস্ত মানব অতিমানব হইয়া উঠিবে, সমগ্র মানবজাতি একেবারেই দেবজাতিতে পরিণত হইবে তাহা নহে—তবে এত বড় এক শক্তির অবতরণের ফল সীমাবদ্ধ থাকিবে না, ইহা বিস্তৃত প্রভাব বিস্তার করিয়া পৃথিবীতে প্রকৃতই যুগান্তর আনয়ন করিবে—স্বতঃই মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে, হৃদয় প্রসারিত হইবে, আজ যে পরস্পরের প্রতি সংশয় ও অবিশ্বাস মানবজীবনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে ইহার পরিবর্ত্তে আসিবে সহানুভূতি ও পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য ; মানবজীবনকে সুগঠিত করিবার জন্য ভগবান কত সুযোগ দিতেছেন, অজ্ঞান অন্ধতার বশে মানুষ তাহা হেলায় হারাইতেছে—এরূপ আর হইবে

না ; মানুষের সত্য, ঘটনার সত্য, বস্তুসকলের অন্তর্নিহিত সত্যের দিকে মানুষের সহজ দৃষ্টি খুলিয়া যাইবে এবং এই ভাবেই হইবে পৃথিবীতে সত্যযুগের সূচনা।

যত অধিক লোক এই আদর্শে বিশ্বাস করিবে, যত অধিক স্থানে মানুষ সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই মহাশক্তির অবতরণের জন্য সাধনা করিবে—ততই এই সত্যযুগের আগমনী আসন্ন হইবে—সমগ্র জগৎবাসীকে এই মহান সাধনার পথ দেখাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ।

সেই মহা বিজ্ঞান-শক্তির অবতরণ কবে কখন হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, তবে মানবজাতি এখন যে সঙ্গীন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহাতে মানব-প্রকৃতিতে একটা আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে সবই ধ্বংস হইয়া যাইবে—তাই মনে হয় ভগবদ্‌কৃপায় সেই পরিবর্ত্তনের সময় আসন্ন। ইতিমধ্যে মানবীয় জীবনের উপর অধ্যাত্মপ্রভাব যত অধিক বিস্তার করা যায় ততই ভাল—এই প্রভাবই মানবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করিবে এবং চরম রূপান্তরের জন্য মানুষকে প্রস্তুত করিয়া তুলিবে। শ্রীঅরবিন্দের যোগ বর্ত্তমান জগতের উপর এই প্রভাবই বিস্তার করিতেছে। প্রথমেই চাই আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস। জড়-বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য্য উন্নতির ফলে আধুনিক মানব

আধ্যাত্মিকতাকে অবহেলা করিয়া বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের দিকেই অতিমাত্রায় ঝুঁকিয়াছিল। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা হইতে বিচ্ছিন্ন বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ মানুষকে কিরূপে অসুরে পরিণত করে, জড়-বিজ্ঞানচর্চ্চায় অগ্রণী জার্ম্মাণীতে নাজী-দলের অভ্যুদয় সে-দিকে জগৎবাসীর দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা কিভাবে মানবজাতির ব্যবহারিক জীবনকে উন্নত করিবে এখনও লোকে তাহা ঠিক মত বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না—কারণ আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্র ও জন্মভূমি ভারত হইতে এ-যাবৎ যে শিক্ষা জগতে প্রচার করা হই-তেছিল তাহা হইতেছে প্রধানতঃ শঙ্করের মায়াবাদ*—তাহা বলে যে, এই সংসার মিথ্যা মায়া, এই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়াই মানব-জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। শ্রীঅরবিন্দ গীতার যে অভিনব নিগূঢ় ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হই-তেছে। শ্রীঅরবিন্দের এই ব্যাখ্যা ইউরোপ ও আমে-রিকায় কিরূপ দ্রুত প্রচারিত হইতেছে সে-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জীন্ হার্বার্ট ((Mr. Jean Herbert Chief Inter-preter of the United Nations' Organisation) সম্প্রতি Vedanta-Kesari পত্রিকায় লিখিয়াছেন—"The

* বেদান্ত বলিতে লোকে সাধারণতঃ শঙ্করের মায়াবাদকেই বুঝে।

connotated versions which Sri Aurobindo gave of the Bhagavad Gita* and Various Upanishads are rapidly displacing previous publications" শ্রীঅরবিন্দের The Life Divine বইখানি বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেছে।

আধ্যাত্মিকতার সহিত জীবনের সমন্বয় কেমন করিয়া হইবে, অপূর্ব্ব যুক্তিমত্তার সহিত তাহা বুঝাইয়া দিয়াই শ্রীঅরবিন্দ ক্ষান্ত হন নাই—তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া পণ্ডিচেরীতে যে আশ্রম গড়িয়া উঠিয়াছে সেখানে ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া দিব্য আদর্শ সৃষ্টি করা হইতেছে। উন্নততর মানবজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম—সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, আর্ট আবার কৃষি, শিল্প সব কিছুরই অনুশীলন এখানে হইতেছে। তবে সাধারণ জীবনে এ-সবের

*এ-পর্য্যন্ত গীতার যত সংস্করণ প্রচলিত ছিল সে-সবই মূলতঃ শঙ্করের ভাষ্যের অনুযায়ী, মায়াবাদ ও সন্ন্যাস-মূলক।

The Message of the Gita—As interpreted by Sri Aurobindo বইখানি বিলাতে বিখ্যাত Allen & Unwin Ltd. কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে এবং ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়া বহুল ভাবে প্রচারিত হইতেছে।

কেন্দ্র হইতেছে অহং, কিন্তু এখানে এ-সবের কেন্দ্র হইতেছেন একমাত্র ভগবান। নিজের জন্য, নিজের ইচ্ছামত কেহ কোন কর্ম্ম এখানে করে না—ভগবানের প্রতিভূ-স্বরূপ গুরু যে কর্ম্ম দেন, ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ হিসাবে সকলেই সেই কর্ম্ম করিয়া থাকে, ইহাই প্রকৃত কর্ম্মযোগ এবং ইহার ভিতর দিয়াই সাধক ও সাধিকাদের অধ্যাত্মজীবন গড়িয়া উঠিতেছে। এই অধ্যাত্ম-জীবনে মানবজীবনের কোন অংশই বাদ যাইবে না—পরন্তু সবই পাইবে দিব্যভাব, দিব্যরূপ। কবি, শিল্পী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক,—সকলেই এই আশ্রমের পরিবেশের মধ্যে থাকিয়া নিজ নিজ অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশ ও পরিণতির যে সুযোগ পাইতেছেন অন্যত্র তাহা দুর্লভ।

বাহিরের বৃহত্তর মানবসমাজের উপরও শ্রীঅরবিন্দের যোগ বিশেষ কাজ করিতেছে—কিন্তু তাহা হইতেছে সূক্ষ্ম-ভাবে—তাহার মর্ম্ম বুঝিতে হইলে যোগসাধনার সহিত নিগূঢ় পরিচয় থাকা প্রয়োজন। যে-সকল পার্থিব ও অপার্থিব শক্তি মানবজীবনকে পরিচালিত করিতেছে তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া যোগীরা কেমন করিয়া মানবজাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন পাঠকগণ পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদে তাহার কিছু পরিচয় পাইবেন।

শ্রীঅরবিন্দ রাজনৈতিক কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে পণ্ডিচেরীতে উপনীত হন। তখন হইতে তিনি যোগসাধনায় ক্রমেই অধিকতর নিবিষ্ট হইয়া পড়েন, সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্য্যধারার সহিত সম্পর্ক বর্জ্জন করেন, এবং কয়েকবার কংগ্রেসের সভাপতি হইবার আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি একটা নিয়মই করেন যে, সাধারণের নিকট কোন বাণী বা বিবৃতি দিবেন না, এবং পরে আর্য্য পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা ভিন্ন কোন প্রবন্ধ বা লেখা প্রকাশ করিবেন না। তবে অধিকাংশ লোকই যে মনে করিয়াছে যে, তিনি সাংসারিক ব্যাপার বা ভারতের ভাগ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া অধ্যাত্ম অনুভূতির কোন উচ্চ শিখরে উঠিয়া গিয়াছেন, ইহাও সত্য নহে। এইরূপ হইতেই পারে না কারণ তাঁহার যোগের লক্ষ্যই হইতেছে শুধু ভগবানকে লাভ করা ও অধ্যাত্ম চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া নহে পরন্তু জীবনকে অধ্যাত্ম ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা এবং আধ্যাত্মিক সার্থকতা প্রদান করা। পৃথিবীতে কোথায় কি হইতেছে, ভারতে কি ঘটিতেছে, শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার নির্জ্জনবাস হইতে সে-সবের ঘনিষ্ঠ সংবাদ রাখিতেন, এবং যখনই প্রয়োজন হইত সাহায্য করিতেন, কিন্তু

তিনি তাহা করিতেন শুধু অধ্যাত্ম শক্তি দ্বারা, নীরব আধ্যাত্মিক ক্রিয়া দ্বারা ; বস্তুত যাঁহারাই যোগের পথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদের ইহা অভিজ্ঞতা যে, জড়জগতে যে মন, প্রাণ, শরীরের কর্ম্ম চলিতেছে তাহা ছাড়া আরও এমন সব শক্তি ও জীব আছে যাহারা ঊর্দ্ধ হইতে এবং পশ্চাৎ হইতে কাজ করিতে পারে এবং করিয়া থাকে। অধ্যাত্মচেতনায় যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারা নানা সিদ্ধি ও শক্তি লাভ করেন, যদিও কেহ কেহ এই সিদ্ধি ও শক্তি অধিকার বা ব্যবহার করিতে চান না—এই অধ্যাত্মশক্তি অন্য সকল প্রকার শক্তি অপেক্ষা প্রবল এবং ফলপ্রদ। শ্রীঅরবিন্দ এই শক্তিলাভ করিবার পর সীমা-বদ্ধ ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত কর্ম্মের জন্য প্রথমে প্রয়োগ করেন ; পরে তিনি ইহা সর্ব্বদা প্রয়োগ করেন আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে, জাগতিক শক্তিসকলের উপর। এইরূপ শক্তি প্রয়োগে তিনি যে ফল পান তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হন এবং অন্য কোন প্রকার সাধারণ কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন না। তবে মাত্র দুইবার তিনি ইহা ছাড়া সাধারণ ভাবেও কর্ম্ম করা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। প্রথমটি ছিল গত মহাযুদ্ধের সম্পর্কে। প্রথম প্রথম তিনি ঐ বিষয়ে কোন কাজ করার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই,

কিন্তু যখন দেখা গেল হিট্‌লার বুঝি তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়-মান সমস্ত শক্তিকেই ধ্বংস করিয়া ফেলিবে এবং পৃথিবীতে নাজীদেরই আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে মিত্রপক্ষের সমর্থন করিলেন, যুদ্ধে কিছু অর্থ সাহায্য করিলেন এবং যাহারা তাঁহার উপদেশ চাহিল সকলকেই তিনি সৈন্যদলে যোগ দিতে এবং যুদ্ধে সকল প্রকার সাহায্য করিতে উৎসাহ দিলেন। ডানকার্কের সময়ে সকলেই যখন মনে করিতে-ছিল যে-কোন মুহূর্ত্তে ইংলণ্ডের পতন হইবে এবং হিট্‌লার নিশ্চিত জয়লাভ করিবে, তখন তিনি আভ্যন্তরীণ ভাবে যোগশক্তির প্রয়োগ করিলেন। তিনি এইরূপ যোগ-শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি যোগদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, হিট্‌লার ও নাজীদের পিছনে রহিয়াছে তমোময় আসুরিক শক্তিপুঞ্জ, তাহাদের বিজয়ের অর্থ হইবে এই যে, মানবজাতির উপর অশুভ শক্তির প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, ক্রমবিবর্ত্তনের গতি প্রতিহত হইবে, বিশেষত মানুষের অধ্যাত্ম ক্রমবিকাশ বিপর্যস্ত হইবে। আর ইহার পরিণাম শুধুই যে ইউরোপের দাসত্ব তাহা নহে, এসিয়া এবং সেই সঙ্গে ভারতের উপর এমন ভীষণ দাসত্বের বোঝা চাপিয়া বসিবে, যাহা আর ইতিপূর্ব্বে

কখনও ঘটে নাই, ভারতের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য এতদিন যে প্রয়াস করা হইয়াছে সে-সব একেবারে পণ্ড হইবে।

যুদ্ধের সমর্থন করিয়া এবং হিট্‌লারের পিছনে যে আসুরিক শক্তি রহিয়াছে সে-সম্বন্ধে নিজমত প্রকাশ করিয়া তিনি যে-সব পত্র লিখিয়াছিলেন তিনি সে-গুলি প্রকাশ করিবার অনুমতি দেন। তিনি ক্রীপ্‌সের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন কারণ—উহা গৃহীত হইলে আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে ব্রিটেন ও ভারত মিলিতভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারিত এবং ক্রীপ্‌স্ যে সমাধান দিয়াছিলেন সেই-টিকে ধরিয়াই ভারত স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারিত। যখন মিটমাট হইল না, তখন শ্রীঅরবিন্দ আবার আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে শুধু তাঁহার যোগশক্তি প্রয়োগের উপরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিলেন।

কিন্তু এ-সবই হইতেছে আনুষঙ্গিক—শ্রীঅরবিন্দের যোগের মূল লক্ষ্য হইতেছে এই পৃথিবীর মানুষকেই দেবতাতে পরিণত করা। বহুদিন পূর্ব্বে একখানি পত্রে তিনি এই আদর্শটি ব্যক্ত করিয়াছিলেন—"দেবতা কেহই নয়, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেবতা আছেন, তাঁকে প্রকট করা দেবজীবনের লক্ষ্য। তা সকলেই করতে

পারে···আমার স্পর্শে জেগে হোক, অপরের স্পর্শে জেগে হোক, কেহ যদি ভিতর থেকে নিজের সুপ্ত দেবত্ব প্রকাশ ক'রে ভগবৎ জীবন লাভ করে, এটাই আমি চাই। এই-রূপ মানুষই এই দেশকে তুলবে।"

যুগ-সন্ধ্যা *

বৈদিক যুগে পরম ঋষিগণ যে দিব্যজীবনের আদর্শ মানবের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন, নানা পতন অভ্যুদয়, নানাবিধ সাধনার মধ্য দিয়া ভারতবাসী, জগৎবাসী এতাবৎকাল যে আদর্শের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যে-আদর্শ সম্বন্ধে বাহ্য চৈতন্যে সুস্পষ্ট জ্ঞান না থাকিলেও অন্তরের প্রেরণায় মানুষ সর্ব্বদা সে দিকে পরিচালিত হইয়াছে, আজ সেইটিকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার, ধরিবার, নিজেদের জীবনের মধ্যে সত্য করিয়া তুলিবার দিন আসিয়াছে এবং তাহাই হইতেছে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার বাণী। এই পরম যুগ-সন্ধিক্ষণে মা বলিয়াছেন,

"আজ সময় এসেছে পথ বেছে নিতে হবেই—একটা পথ, একান্তভাবে, সর্ব্বতোভাবে। হে ভগবান, আমাদের সামর্থ্য দাও যেন মিথ্যাকে দূরে ফেলে দিয়ে তোমার সত্যের মধ্যে উঠে দাঁড়াতে পারি—পূর্ণ শুদ্ধ হ'য়ে, তোমার বিজয়ের যোগ্য হয়ে।"

---

* দিনাজপুর শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের উদ্বোধনে (২৬।৯।৪৩) পঠিত।

সেই সত্য কি, পথ কি, সেই দিব্য বিজয়ের প্রকৃত মর্ম্ম কি, শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার নানা রচনার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণকে সেই সব রচনা পাঠ ও আলোচনার সুযোগ দিবার নিমিত্ত আমরা শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া এই পাঠমন্দিরের উদ্বোধন করিতেছি। শ্রীঅরবিন্দ দিব্যদৃষ্টিতে মানবীয় পূর্ণতার যে আদর্শ দেখিয়াছেন তাহাতে মানবজীবন, মানব ব্যক্তিত্বের কোন অংশই বাদ যায় নাই; মানুষের দেহ, প্রাণ, মনের সকল অংশ, সকল ক্রিয়া মিথ্যা ও বিকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া তাহাদের সত্য স্বরূপ ও পূর্ণতা লাভ করিবে ইহাই শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ। তাই শ্রীঅরবিন্দের রচনায় আমরা জীবনের সকল সৃষ্টি ও কর্ম্মের সকল ধারারই সত্য পরিচয় লাভ করি। তাঁহার The Life Divine গ্রন্থ সম্বন্ধে ভারতের এক প্রবীণ দার্শনিক অধ্যাপক বলিয়াছেন, "যুক্তি তর্ক প্রমাণের দ্বারা পরম তত্ত্ব সকলের এরূপ আলোচনা ও মীমাংসা সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এ-পর্য্যন্ত আর কখনও হয় নাই।" সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য মনীষি Sir Francis Younghusband বলিয়াছেন, "আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিতই বলিতে পারি যে, এইটিই হইতেছে এই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।" কিন্তু

শ্রীঅরবিন্দ শুধু দর্শনশাস্ত্রে তাত্ত্বিক আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সেই সকল তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া কি ভাবে মানবজীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে সে-সম্বন্ধে তিনি The Synthesis of Yoga গ্রন্থে যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে স্মরণাতীত কাল হইতে অনুষ্ঠিত সকল যোগ, সকল সাধনপন্থার অপূর্ব্ব সুগভীর সমন্বয় হইয়াছে। আর কার্য্যতঃ কি ভাবে ঐ সমন্বয়কে মানবজীবনে সত্য করিয়া তুলিতে পারা যায় পণ্ডিচেরী আশ্রমে তাহারই সাধনা চলিতেছে—The Mother, Lights on Yoga, Bases of Yoga প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা তাহার কিছু পরিচয় পাই। মানবজীবনকে পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসিদ্ধ করিয়া তুলিতে হইলে সাহিত্য, সুকুমার-শিল্প, রাজনীতি, সমাজনীতি সব কিছুরই উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা আছে এবং শ্রীঅরবিন্দের রচনায় আমরা এই সকল বিষয়েই গভীর ও বিশদ আলোচনা দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য মার্ক্‌স্‌বাদ আজকাল আমাদের দেশের অনেক যুবককেই আকৃষ্ট করিতেছে। ঐ মতবাদের মূল কথা এই যে অর্থনৈতিক শক্তি ও পরিস্থিতির দ্বারাই মানবীয় ইতিহাসের ধারা নির্দ্ধারিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার The Psychology of Social

Development গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, মানবজীবনে অর্থ খুবই প্রয়োজনীয় হইলেও উহা কেবল বাহ্য উপকরণ, বহিরঙ্গ। চৈতন্যের বিকাশেই মানুষ ক্রমশঃ উচ্চতর মানবত্ব ও অতিমানবত্বের দিকে অগ্রসর হইয়াছে এবং এই সূত্র ধরিয়াই মানবীয় সমাজ বিকাশের মূল তত্ত্বগুলির সন্ধান পাওয়া যায় ও আদর্শ মানবসমাজ গঠনের ইঙ্গিত লাভ করা যায়। The Ideal of Human Untiy গ্রন্থে তিনি জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের গভীর তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন কি-সব নিগূঢ় শক্তি অলক্ষ্যে মানবের সমাজ রাষ্ট্র, মানবের ইতিহাস গঠিত ও পরিচালিত করিতেছে এবং এক মহান মানবীয় ঐক্যের দিকে জগৎকে লইয়া চলিয়াছে। আজ সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে দূরত্বের ব্যবধান অপসারিত হওয়ায় সমস্ত মানবজাতি এক-সমাজ, এক-পরিবারে পরিণত হইয়াছে, অতএব সমগ্র পৃথিবীর উপর এখন এক-রাষ্ট্র স্থাপন করিলেই যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যা এবং অন্যান্য মানবজাতীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সমগ্র পৃথিবীকে একই রাষ্ট্রের অধীনে আনিতে হইলে যে যন্ত্রবৎ বিরাট organisation গড়িয়া

তুলিতে হইবে তাহাতে বিভিন্ন দেশ ও জাতির স্বাতন্ত্র্য এবং সেই সঙ্গে বৈশিষ্ট্য ও সৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অথচ কোনরূপ বিশ্ব-রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপন করা আজ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কি করিলে সকল দিক বজায় থাকিয়া মানবজাতির মহান ঐক্য গঠিত হইতে পারে সে-সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের আলোচনা সাতিশয় হৃদয়গ্রাহী এবং শিক্ষাপ্রদ। প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে Arya পত্রিকায় প্রকাশিত এই গ্রন্থখানিতে তিনি যে-সব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এখন সেগুলি আশ্চর্যভাবে ফলিতেছে। ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির উপর পাশ্চাত্য সমালোচকগণের আক্রমণের জবাব দিয়া তিনি A Defence of Indian Culture গ্রন্থে ভারতীয় দর্শন, ধর্ম্ম, সাহিত্য, চারুশিল্প, রাজনীতি, সমাজনীতির যে নিগূঢ় ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক সমালোচনা করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ধারাটি সমুজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। মানবজীবনকে পূর্ণসমৃদ্ধ করিতে হইলে এই সব জিনিষই প্রয়োজন এবং আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই এই সব জিনিষ তাহাদের প্রকৃত শক্তি ও স্বরূপ লাভ করিতে পারে—ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস হইতেই শ্রীঅরবিন্দ ইহা সুন্দরভাবে বুঝাইয়া

দিয়াছেন। এই দিক দিয়া ভারতীয় সভ্যতাই হইবে বিশ্বসভ্যতার পথপ্রদর্শক এবং তাহাই বর্ত্তমান ভারতের প্রকৃত সাধনা।

শ্রীঅরবিন্দের কাব্যরচনাও অপরূপ সৃষ্টি। একদিকে নির্ব্বাণ, সমাধি, মুক্তি, রূপান্তর প্রভৃতি অধ্যাত্ম উপলব্ধি ও সিদ্ধির কাব্যময় প্রকাশে তিনি বেদ ও উপনিষদের ঋষিদেরই সহিত তুলনীয়, অন্যদিকে এই রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময় বাহ্য জগতেও যে কত সৌন্দর্য্য ও আনন্দ আছে তাহার প্রকাশে তিনি কালিদাস, কীট্‌স, রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনীয়। এক কথায় পূর্ণ মানবত্ব গঠনের জন্য এবং মানবতাকে অতিক্রম করিয়া অতিমানবত্ব লাভের জন্য যাহা কিছু শিক্ষা প্রয়োজনীয়, শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে সে-সমুদয়ই আমাদিগকে প্রচুরভাবে দিয়াছেন।

মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য কি এবং কেমন করিয়া সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাইতে পারে সে-সম্বন্ধে যত প্রকার মত প্রচলিত আছে তাহাদিগকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—বৈরাগ্যবাদ ও ভোগবাদ। প্রথম মতানুসারে জগৎ ও জীবন মিথ্যা মায়া—একমাত্র নীরব, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার ব্রহ্মই সত্য এবং এই সংসার ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে লীন হওয়াই মানবজীবনের

প্রকৃত লক্ষ্য। অথবা এই পৃথিবী একেবারে মিথ্যা মায়া না হইলেও ইহা দুঃখ ও পাপের ক্ষেত্র, এখান হইতে ঊর্দ্ধে কোন স্বর্গলোকে যাওয়াই মানবের প্রকৃত লক্ষ্য এবং তজ্জন্য এই সংসারের জীবনকে সর্ব্বপ্রকারে রিক্ত ও শুষ্ক করাই প্রকৃত পন্থা। ভারতে বুদ্ধ ও শঙ্কর এবং ইউরোপে মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিগণ যথাক্রমে এই দুইটি মত প্রচার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ভারতে প্রথমোক্ত মতটি প্রচার করিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং দ্বিতীয় মতটি প্রচার করিয়াছেন মহাত্মা গান্ধী। দ্বিতীয় শ্রেণীর মত হইতেছে ভোগবাদ, ঐহিকতাবাদ—এই মতানুসারে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া না থাকিয়া এই পার্থিব জীবনকে সর্ব্বতোভাবে বিকাশ ও ভোগ করাই মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য; আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে এই মতটিই বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছে। এই সকল মতের মধ্যেই কিছু সত্য আছে। কিন্তু মানুষের জীবন ও ব্যক্তিত্ব বহুমুখী; উল্লিখিত মতগুলির কোন একটিকে লইয়া মানুষ সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা এই সকল মতেরই আভাস পাই—কখনও তিনি একটির উপর, আবার কখনও আর একটির উপর জোর দিয়াছেন। কখনও তিনি বলিয়াছেন,

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাহি।

আবার কখনও বলিয়াছেন,

দুর্গম পথ এ-ভব গহন
কত শোক তাপ বিরহ দহন,
জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন
প্রাণ পাই যেন মরণে,
সন্ধ্যা বেলায় লভি গো কুলায়
নিখিল শরণ চরণে।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই সকল বিভিন্ন মতের এমন কোন সমন্বয় হয় নাই যাহাতে মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্যটি সমগ্রভাবে ধরা যায়। কিন্তু এই সমন্বয় যে হইতে পারে ও হইবে সে-বিশ্বাস তাঁহার ছিল এবং ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তিনি পান যখন তিনি পণ্ডিচেরীতে আসিয়া শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করেন। সেই উপলক্ষ্যে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—"আমার মন বল্‌লে, ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বালবেন। অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারি মধ্যে মনে হলো, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত। কোনো খরদন্তর মতের উপদেবতার নৈবেদ্যরূপে সত্যের উপলব্ধিকে

তিনি ক্লিষ্ট ও খর্ব্ব করেন নি। তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্য্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা। মধ্যযুগের খৃষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত ও শুষ্ক করাকেই চরিতার্থতা বলেন নি। আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন, যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেব বিশন্তি। আমি তাঁকে বলে এলুম, আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাক্‌বো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে, শৃণ্বন্তু বিশ্বে।" ("India will speak through your voice to the world, Hearken to me".) রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের দুইটি সত্যকে অতি স্পষ্টভাবে ধরিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, মানুষের পূর্ণতা এই পৃথিবীতেই, অন্য কোথাও নহে। দ্বিতীয়তঃ, সেই পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে আত্মার সন্ধান করিতে হইবে, আত্মাকে লাভ করিতে হইবে; আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই এই মর্ত্ত্য জীবন অমৃতত্বে পরিণত হইবে এবং সেইটিই ছিল তাঁহার গভীরতম আকাঙ্ক্ষা—

মর্ত্ত্যের অমৃতরসে দেবতার রুচি
পাই যেন আপনাতে,
সীমা হতে সীমা যায় ঘুচি।

ইহা বেদেরই প্রতিধ্বনি—

ত্বং তমগ্নে অমৃতত্ব উত্তমে মর্ত্তং দধাসি শ্রবসে দিবেদিবে।
যস্তাতৃষাণ উভয়ায় জন্মনে ময়ঃ কৃণোষি প্রয় আ চ
সূরয়ে ॥ ঋগ্বেদ ১।৩১।৭

কিন্তু মর্ত্ত্যের এই অমৃতরসের সঙ্গে বিষ মিশিয়া রহিয়াছে। সৃষ্টি-সমুদ্র মন্থনে যেমন অমৃত উঠিয়াছে তেমনই গরলও উঠিয়াছে, যেমন দেবতা উঠিয়াছে তেমনই অসুরও উঠিয়াছে এবং মানুষের জীবনকে লইয়া দেবতা ও অসুরের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। দেবতা চাহিতেছে মানুষের মধ্যে সত্য, শিব, সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করিতে ; কিন্তু এই সব দিব্য সম্পদের প্রতি মানুষের গভীর তৃষ্ণা থাকিলেও মানুষ এই সবকে পূর্ণভাবে, অবিকৃতভাবে লাভ করিতে পারিতেছে না কারণ আজও পৃথিবীতে অসুরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত, মানুষের সব কিছুকেই সে অশুদ্ধ ও বিকৃত করিয়া দিয়া মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা হা-হুতাশে আসুরিক আনন্দ উপভোগ করিতেছে। মানুষের সত্য, মানুষের কর্ম্ম, মানুষের প্রেম—কিছুই শুদ্ধ, নির্দ্দোষ, অবিকৃত থাকিতে পারে না। কিন্তু মানুষ যুগে যুগে তাহার জন্য সাধনা করিয়াছে—আজ দিন আসিয়াছে যখন মানবজীবনকে সকল আসুরিক প্রভাব হইতে মুক্ত করা

যাইতে পারে, মানুষের মধ্যে অমৃতত্ব ও দিব্য জীবন গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। আসুরিক শক্তি, আসুরিক প্রভাবকে ধ্বংস করিবার জন্য আজ আবার রুদ্রের বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে—আজিকার বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ তাহারই নিদর্শন। আজও যাহারা মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিবে, অসুরের প্রভাবকেই বরণ করিয়া লইবে তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। আর যাহারা আজ যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া সত্যকে বরণ করিতে পারিবে তাহারা জগতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিবার পরম গৌরব লাভ করিবে। আজ আমাদের সকলেরই হৃদয় হইতে ঐকান্তিক প্রার্থনা উত্থিত হউক, "হে ভগবান, আমাদের সামর্থ্য দাও যেন মিথ্যাকে দূরে ফেলে দিয়ে তোমার সত্যের মধ্যে উঠে দাঁড়াতে পারি—পূর্ণ শুদ্ধ হয়ে, তোমার বিজয়ের যোগ্য হয়ে।"

মায়াবাদ

মায়াবাদ ও আধুনিক আদর্শ

ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—ইহাই মায়াবাদ। কোন না কোন ভাবে এই মায়াবাদ জগতের সকল ধর্ম্মেই প্রবেশ করিয়াছে, এবং আধুনিক সভ্য সমাজে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহারও মূল এই মায়াবাদ।

এই জগৎ দুঃখময়। এখানে সাধন ভজন ও পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা মানুষকে যোগ্য হইয়া উঠিতে হইবে, যেন সে এই জগতের উর্দ্ধে, পরলোকে, প্রকৃত সুখ শান্তির অধিকারী হইতে পারে।

শান্তি নিকেতন ছাড়ি
কোথা শান্তি পাবে বল ?
সংসারে শান্তির আশা
মরীচিকায় যথা জল।

ইহাই মূলতঃ সকল ধর্ম্মের শিক্ষা, এবং এই শিক্ষা মানুষকে সংসারের প্রতি, জগতের প্রতি বিমুখ করিয়াছে।

ধর্ম্মভাবের দ্বারা যাঁহারা প্রভাবিত তাঁহারা সাংসারিক উন্নতির প্রতি উদাসীন হইয়া পড়েন, নিজেদের পরকালের চিন্তায়, মোক্ষের চিন্তায় মগ্ন হইয়া থাকেন। এই জন্য অনেকেই আজকাল ধর্ম্মভাবকে একটা মানসিক বিকৃতি (mental defect) বলিয়া উহা হইতে সরিয়া থাকিতে চাহিতেছেন। যতদিন মানুষ অন্ধ বিশ্বাসের বশে পরলোকের সুখের আশায় ইহলোকের সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিত, তত দিনই ছিল ধর্ম্মের প্রাধান্য। কিন্তু এখন আসিয়াছে যুক্তি-বাদের (Rationalism) যুগ। ভগবান কে বা কোথায় আছেন জানি না, দেখিতে পাই না। পরলোক, পরকাল বলিয়া কিছু আছে কি না—সে সম্বন্ধেই প্রমাণাভাব। অথচ চক্ষুর সম্মুখেই দেখিতেছি এই জগৎ, এই মানবজীবন, —চেষ্টা করিলে ইহাকে দুঃখ-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া অশেষ সুখ ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ করিয়া তোলা যায়। তাহা না করিয়া ধর্ম্মভাবের বশে বহু প্রতিভাশালী মানুষ যে সংসার-বিরাগী হন, বর্ত্তমান সভ্যতা-সঙ্কটের মূল কোথায় সে সন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া আত্ম-চিন্তায় মগ্ন থাকেন. এইটাই আজকাল মানবসভ্যতার এক পরম বিপদ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। যে-সব মনীষি নির্জ্জনে তপস্যা করিতেছেন, তাঁহারা যদি দেশের কাজে, সমাজের কাজে

আত্মনিয়োগ করেন, তাহা হইলে আধুনিক সমস্যাসকলের সমাধান সহজ হইয়া পড়ে। কিন্তু, জগৎকে মিথ্যা বলিয়া ধারণা করাই যাঁহাদের সাধনার লক্ষ্য, তাঁহারা কেমন করিয়া এই সকল সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হইবেন?

অবশ্য ধর্ম্মভাবের বশে লোকে যে জগতের হিতসাধন করে না, তাহাও সত্য নহে। মানবের দুঃখ দূর করা ধর্ম্মেরও লক্ষ্য। দান, সদাব্রত, পরোপকার, মানবের সেবা, সর্ব্ব-জীবের সেবা—এ-সব সকল ধর্ম্মেরই অঙ্গ। তবে ধর্ম্ম মানুষের যে কল্যাণ করিতে চায়, তাহা হইতেছে আধ্যাত্মিক কল্যাণ, পারলৌকিক কল্যাণ। ধর্ম্ম মূলতঃ মানুষকে এমন শিক্ষা দিতে চায়, যাহাতে সে সংসারে অনাসক্ত হইয়া পরকালের চিন্তায় মগ্ন হয়, এবং এই ভাবেই সংসারের অবশ্যম্ভাবী দুঃখ-সকলের আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে পারে। যাহারা শুধু নিজেদের আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভের জন্য সাধনা করে, তাহাদের পন্থাকে হীনযান বলিয়া নিন্দিত করিয়া বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায় জগতের সমুদায় মানুষের অধ্যাত্মমুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়াকেই নিজেদের সাধনার লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক যুক্তিবাদের যুগে এই মহাযানও এক প্রকার হীনযান বলিয়াই পরিগণিত হইতেছে, কারণ, ইহা সকল মানুষকেই সংসারলীলা হইতে

সরাইয়া নির্ব্বাণের দিকে লইয়া যাইতে চায়। সকল ধর্ম্মের লক্ষ্য অবশ্য নির্ব্বাণ বা আত্মলোপ-সাধন নহে। মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া মানুষ অশেষ সুখ ভোগ করিবে, ইহাই সাধারণতঃ ধর্ম্ম-সাধনার লক্ষ্য। কিন্তু এই যে স্বর্গ-সুখ ভোগ, ইহা আধুনিক যুগের মানুষকে আর আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না, তাহাদের প্রাণ কাঁদিতেছে এই মর্ত্ত্যের জন্য। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের পরিকল্পিত স্বর্গ-সুখ সম্বন্ধে জনৈক ইংরাজ সমালোচক সম্প্রতি বলিয়াছেন,—"যে স্বর্গরাজ্যে বিবাহ নাই, বিবাহ দেওয়া নাই, জীবন বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার কিছুই নাই, তাহার সহিত বৌদ্ধদের নির্ব্বাণের তফাৎ কতটুকু?"

শঙ্করাচার্য্যের শিক্ষা হইতেছে, নারী নরকের দ্বার, অর্থম্ অনর্থম্, কৌপীনবন্তম্ খলু ভাগ্যবন্তম্। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের শিক্ষা, একটা উষ্ট্রের পক্ষে সূচের ছিদ্রে প্রবেশ করা অপেক্ষাও একজন ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন। যাহারা এই শিক্ষায় প্রভাবিত, তাহাদের দ্বারা সাংসারিক জীবনের কি উন্নতি সাধিত হইবে? সকল সাধু ব্যক্তি, ধার্ম্মিক ব্যক্তি অর্থকে অনর্থ বলিয়া যদি দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অধার্ম্মিক ও অসাধু ব্যাক্তিদের হস্তেই জগতের সমস্ত অর্থ সঞ্চিত হইবে, এবং অর্থ-শক্তির

অপব্যবহারে জগতে অনর্থের সীমা থাকিবে না। বস্তুতঃ বর্ত্তমান জগতে যে ভীষণ সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, ইহার একটি মূল কারণ অর্থশক্তির অপব্যবহার। অতএব, অর্থকে অসাধুদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া সৎকার্য্যে, ভগবানের কার্য্যে প্রয়োগ করা, মানব-সমাজের জন্য সমৃদ্ধিশালী সৌন্দর্য্যময় দিব্য-জীবন গড়িয়া তোলা—ইহাই সাধু মানবের কর্ত্তব্য। কিন্তু যাঁহারা মায়াবাদের প্রভাবে কাঞ্চনকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে চান তাঁহাদের দ্বারা ইহা সম্ভব নহে।

জর্ম্মণ দার্শনিক নীট্‌শে বলিয়াছেন—"জীবনের দিকে! জীবন—আরও, আরও জীবন! এস, জগৎকে অনন্তকাল ধরিয়া নিত্য নূতন জীবনে ভরিয়া তুলি!···ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমাদের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ ধরিত্রীর প্রতি একনিষ্ঠ হইয়া থাকিও, যাহারা তোমাদিগকে পরলোকের আশা দিয়া রাখে, তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিও না। জীবনকে তাহারা ঘৃণা করে, তাহারা যে মুমূর্ষু, নিজেরাই তাহারা বিষ পান করিয়াছে, পৃথিবীর কাছে তাহাদের ভার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে! বিদায় হউক তাহারা! ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমাদের সকল ধর্ম্মবল দিয়া এই পৃথিবীরই প্রতি একনিষ্ঠ হইয়া থাক।"—(নীট্‌শের বাণী—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত)।

ইহাকে মায়াবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া বলা যাইতে পারে। ইহাই আধুনিক যুগবাণী, কালপুরুষের ইঙ্গিত, ইহাকে অবহেলা করিয়া কোন সমস্যারই সমাধান হইতে পারে না।

সাংসারিক দুঃখের প্রতিকার

সংসারের দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের দুইটি পন্থা আছে। একটি পন্থা, মন-প্রাণকে এমন ভাবে গড়িয়া তোলা, যাহাতে সংসারের কোন দুঃখ-যন্ত্রণাই আর বিচলিত করিতে না পারে। আর একটি পন্থা হইতেছে, সংসারে যাহাতে দুঃখ না থাকে তাহার ব্যবস্থা করা, দুঃখের কারণ সমুদয় দূর করা। প্রথমটি অধ্যাত্ম-সাধনার পথ। কিন্তু সুখ-দুঃখের অতীত ঐরূপ মানসিক অবস্থা লাভ করিতে হইলে যে সাধনার প্রয়োজন, তাহা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নহে। সংসারে সকল জিনিষের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে, সকল বাসনা বর্জ্জন করিতে হইবে, সকল স্নেহ-মায়ার বন্ধন, ভালবাসার বন্ধন নিজ হস্তে ছিন্ন করিয়া ত্যাগী, বৈরাগী, সন্ন্যাসী হইতে হইবে—তবেই প্রকৃত শান্তিলাভ হইবে। এইরূপ কঠোর সাধনা দুই চারিজন লোকের পক্ষে সম্ভব হইলেও, সংসারের যে দুঃখময় অবস্থা তাহার কোন প্রতিকারই হয় না; অধিকাংশ লোককেই

দুঃখের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে হয়। উচ্চ অধ্যাত্ম-জীবন লাভ করিয়া সন্ন্যাসীরা সাধারণ মানুষের দুঃখ দূর করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, সে আশাও খুব কম। কারণ, যাঁহারা দেখিতেছেন দুঃখ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, সেই মিথ্যা দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা তাঁহারা কেন করিবেন ? বিশেষতঃ সর্ব্বদাই তাঁহাদের আশঙ্কা থাকে যে, সাংসারিক কর্ম্মে ব্রতী হইলে, আবার হয় ত তাঁহারা জড়াইয়া পড়িবেন, এত কষ্ট করিয়া তাঁহারা যে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, হয় ত তাঁহাদের সে-সব সাধনা পণ্ড হইয়া যাইবে! বস্তুতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা জনহিতকর কর্ম্মে, সেবার কর্ম্মে ব্রতী থাকেন, তাঁহারা ভিতরে আধ্যাত্মিকতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন না। আবার অধ্যাত্ম সাধনার দিকে অগ্রসর হইলে কর্ম্ম আপনা হইতেই কমিয়া যায়! শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "প্রথম প্রথম কর্ম্মের খুব হৈ চৈ থাকে। ঈশ্বরের পথে যত এগুবে ততই কর্ম্ম কম্‌বে। শেষে কর্ম্ম ত্যাগ আর সমাধি।"

অন্য পন্থা হইতেছে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর না হইয়া কর্ম্মের দ্বারাই যতদূর সম্ভব সংসারের দুঃখ-কষ্টের প্রতিকার করা, এবং এইটিই আধুনিক আদর্শ। যাঁহারা এই আদর্শের অনুসরণ করিতে চান, ধর্ম্মকে মানবজীবন হইতে বাদ দিতে

চান, তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করিলেই সমস্যার সমাধান হইবে না। তাঁহারা বুদ্ধিমান, প্রাণবান, আপন আপন মতে আন্তরিক শ্রদ্ধাবান। তাঁহারা মানবের কল্যাণ চান, জগতের কল্যাণ চান এবং সেজন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত। কেবল তাঁহারা মানুষের উপরে আর কিছু স্বীকার করা প্রয়োজন মনে করেন না।

"সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই"

ইহাই তাঁহাদের বাণী। মানবের সেবা, মানবজাতির কল্যাণ সাধন, উন্নতি সাধন—ইহাকেই তাঁহারা ধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন (humanism), এবং ইহার জন্য জপ, তপ, কৃচ্ছ্র সাধনে মগ্ন না থাকিয়া তাঁহারা বিপুল কর্ম্মের সাধনা করিতে চান। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের হস্তে এমন সব শক্তি আনিয়া দিয়াছে যে, মানুষ অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার প্রভৃতি বর্জ্জন করিয়া যুক্তিসঙ্গত ভাবে যদি সে-সব প্রয়োগ করে, তাহা হইলে এই ধরিত্রী সুখ, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। রোগের প্রকোপ দূর হয়, সকলেই সৌখীন, সচ্ছল, সৌন্দর্য্যময় জীবন যাপন করিয়া পৃথিবীকে পূর্ণ ভাবে উপভোগ করিতে পারে। ইতিমধ্যেই অনেক পাশ্চাত্য দেশ এই দিকে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। যে-সব রোগের

প্রকোপে ভারতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, অথবা শোচনীয় রুগ্ন জীবন যাপন করিতেছে, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে সে-সব সম্পূর্ণভাবে দূর হইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। সে-সব দেশ গার্হস্থ্য জীবনকে সুখ-সুবিধায় পূর্ণ করিবার জন্য কত রকম যে অভিনব আয়োজন করিয়াছে ও করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমেরিকার কুলী-মজুরদেরও এমন আর্থিক সচ্ছলতা যে তাহারা নিজেদের মোটরে চাপিয়া মজুরী করিতে যায়! রাশিয়া প্রভৃতি ইয়োরোপের সকল দেশের আদর্শ হইতেছে ইহাই। আর তথাকথিত ধর্ম্ম-ভাবের বশে ভারত চলিয়াছে ঠিক বিপরীত দিকে! কোন রকম সুখ ভোগ করাটাই যেন পাপ,—সকল রকম কৃচ্ছ্র সাধন করাই পুণ্য—ইহাই আজকাল ধর্ম্মের আদর্শ, ধর্ম্মের শিক্ষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দারিদ্র্যময়, নগ্ন, এমন কি কুৎসিত জীবনকেই মহান বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা হইতেছে। যাঁহারা জীবনবাদী, কর্ম্মবাদী, তাঁহারা যে এই শিক্ষার বিরোধী হইবেন, "ধর্ম্মদ্বেষী" হইবেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। সংসারের সকল ভোগ সুখ যদি পরিত্যাগই করিতে হইবে, তাহা হইলে ভগবান এই ঐশ্বর্য্যময় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন কেন?

নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, এই দুইটি পন্থার মধ্যেই কিছু সত্য রহিয়াছে। কিন্তু, কোনটিই পূর্ণ বা সমগ্র সত্য নহে। বিজ্ঞানের দ্বারা জীবনের বাহ্য সমৃদ্ধি যতই বৃদ্ধি করা হউক, যত দিন না মানুষের ভিতরটা শুদ্ধ ও বুদ্ধ হইতেছে, তত দিন সে কিছুতেই প্রকৃত সুখ, শান্তি, আনন্দ লাভ করিতে পারিবে না। আমেরিকা আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী, আবার সেই আমেরিকাই পাপের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে মানুষ মানুষের উপর যে অত্যাচার করে তাহা বর্ণনাতীত। অন্নবস্ত্রের অভাবটা খুবই বড় দুঃখ এবং তাহার সম্যক প্রতিকার আগে চাই। কিন্তু যথেষ্ট আর্থিক সম্পদ হইলেই মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান হয় না। জগতে ধনী ব্যক্তি অনেকেই আছে, কিন্তু তাহাদের জীবনকে আদর্শ বলা চলে কি? যে যত ধনী, তাহার তত আকাঙ্ক্ষা, তত লোভ এবং তত অশান্তি। কাম, ক্রোধ, লোভ—এই তিনটিই মানুষের পরম শত্রু, গীতার ভাষায় এই তিনটি নরকের দ্বার। যত দিন না মানুষ এই তিনটি পরম শত্রুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছে, তত দিন তাহার সকল আদর্শানুসরণই ব্যর্থ হইবে। আর এই তিনটিকে দমন করা যায়, নির্ম্মূল করা যায় কেবল অধ্যাত্ম-সাধনার দ্বারা।

এই তিনটিরই মূল হইতেছে অহং ভাব, Egoism। জগতে যত অত্যাচার, অশান্তি, দুঃখ, দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, তাহার মূলে রহিয়াছে এই অহং—ব্যক্তির অহং, দেশের অহং, জাতির অহং, সঙ্ঘের অহং, ধর্ম্মের অহং। এবং অহংয়ের ধর্ম্মই হইতেছে, অপরকে খর্ব্ব করিয়া, গ্রাস করিয়া নিজকে বড় করা। মানবসমাজে নানা স্তরের অহং যে আপনাকে বড় করিতে ব্যস্ত ইহাই কাম, ক্রোধ, লোভের মূল এবং সংসারে সকল প্রকার দুঃখের মূল। যেদিন মানুষ অহং-ভাব জয় করিবে, নিজের জন্য যে চেষ্টা করিতেছে, পরের জন্য তাহা করিবে, পরের কল্যাণ সাধনে জীবনকে উৎসর্গ করিয়া তাহার প্রতিদানে যাহা পাওয়া যায় তাহাই ভগবানের প্রসাদরূপে সানন্দে গ্রহণ করিবে, সেই দিন এই পৃথিবী হইবে প্রেমের রাজ্য, স্বর্গরাজ্য।

কিন্তু মানুষের অহংভাব দূর হইলে, আর তাহার থাকিবে কি? তখন ত সে পরমব্রহ্মে লীন হইবে, নির্ব্বাণ লাভ করিবে। তখন জগৎ হইবে মিথ্যা, জীবন হইবে মিথ্যা। তখন কোথায় থাকিবে পৃথিবী, আর কোথায় বা প্রেমের রাজ্য! অন্ততঃ, ইহাই মায়াবাদের শিক্ষা। মূল কথা, মায়াবাদই যদি আধ্যাত্মিকতার চরম সত্য হয়, তাহা হইলে জীবন-সমস্যার কোন সমাধানই নাই। আধ্যাত্মিকতার

দ্বারা জগতের কোন কল্যাণ সাধিত হওয়া সম্ভব নহে, কারণ, তাহা অহংজ্ঞানকে নষ্ট করিয়া মানুষকে সংসার-বিরাগী করিবে। আবার আধ্যাত্মিকতাকে বাদ দিয়া অহংকে ধরিয়া থাকিলে মানুষ এখনও যে পশুত্বের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা হইতে আর একটি ধাপও উপরে উঠা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। এইটিই বর্ত্তমান যুগসমস্যা, "the present crisis in civilisation" এর মূল সূত্র।

আধ্যাত্মিকতা ও জীবন

ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন যে আধ্যাত্মিকতাই ভারতের যত দুর্গতির মূল। কিন্তু, ভারত চিরকালই আধ্যাত্মিক, অর্থাৎ, ভারতের যে সভ্যতা তাহা আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ন্যায় জড়বাদ (materialism) ও বিজ্ঞানের (science) উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা বৈদিক ঋষিগণের অধ্যাত্ম-সাধনালব্ধ গভীরতর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে ভারতের ঐহিক জীবনে কোন ক্ষতিই হয় নাই। বরং ভারত আধ্যাত্মিকতা হইতে জীবন-লীলায় যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সে কৃষ্টি ও সভ্যতার উচ্চতম

শিখরে উঠিতে সমর্থ হইয়াছিল; কয়েক সহস্র বৎসর কাল ধরিয়া ঐহিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে,—রাষ্ট্রে, সমাজে, শিল্পে, বাণিজ্যে, সাহিত্যে অপূর্ব্ব কর্ম্মশক্তি, অপূর্ব্ব সৃষ্টিশক্তি দেখাইয়াছিল। ভারতের জ্ঞানসম্পদ, ভারতের ঐশ্বর্য্যসম্ভার ভারতের বীরত্ব, প্রতিভা, কর্ম্মকুশলতা জগৎবাসীর বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছিল। কিন্তু তখন ভারত যে অধ্যাত্মসত্যকে ধরিয়াছিল তাহা মায়াবাদ নহে, তাহা হইতেছে—ব্রহ্ম সত্য, জগৎও সত্য, জগৎ ব্রহ্মেরই আত্মপ্রকাশলীলা, আনন্দলীলা। ভারতীয় সভ্যতার, ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষার মূল উৎস বেদ ও উপনিষদসমূহে আমরা এই অধ্যাত্মতত্ত্বই দেখিতে পাই। তাই তখন গার্হস্থ্য আশ্রমকে খুব উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছিল। সন্ন্যাস ছিল কেবল স্বল্পসংখ্যক যোগ্য লোকের পক্ষে চরম আদর্শ। যখন শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তি লইয়া ভারতের আপামর জনসাধারণের মধ্যে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই মায়াবাদ প্রচার করিলেন, যখন প্রচার করিলেন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পর গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ না করিয়া একেবারে সন্ন্যাস গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়, প্রশংসনীয়, যাহারা অক্ষম কেবল তাহাদের জন্যই গার্হস্থ্যাশ্রম, তখন হইতেই ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন সামঞ্জস্য নষ্ট হইল, বৌদ্ধগণ যে-সংসার-

বিমুখতা প্রচার করিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্য তাহাই আরও ব্যাপকভাবে দেশবাসীর মনের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তখন হইতেই ঐহিক জীবনে ভারতের প্রকৃত অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। গার্হস্থ্য জীবনকে অতি হীন চক্ষে দেখা হইল, তাহাকে বিধিনিষেধের অসংখ্য বন্ধনে পিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল,—দেশের, সমাজের উন্নতি ও প্রসার বিধায়ক সর্ব্বপ্রকার মহান চেষ্টার প্রেরণা নষ্ট হইল। স্ত্রী, পুত্র, ক্ষুদ্র পরিবার লইয়া কোন রকমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা, দিনগত পাপক্ষয় করা, ইহাই হইল গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ। এই ভাবে সমস্ত দেশ, সমস্ত জাতি ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি হারাইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাহারই পরিণাম ভারতের পরাধীনতা এবং বর্ত্তমান দুর্দ্দশার চরম।

খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মধ্যেও এই মায়াবাদের প্রভাব রহিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রচারে ইয়োরোপে এইরূপ কুফল ফলে নাই, কারণ ইয়োরোপ কোন দিনই ভারতের ন্যায় ধর্ম্মকে, আধ্যাত্মিকতাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নাই। ধর্ম্ম সেখানে একটা সৌখীনতার সামগ্রী। যেখানে জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত হইবে সেখানে ধর্ম্মকে তাহারা বাদ দিয়া চলে। ভারতে যেমন সমস্ত জীবনই ধর্ম্ম, ধর্ম্মের শিক্ষার দ্বারা সমগ্র ঐহিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করাই আদর্শ, ইয়োরোপে

তাহা নহে। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের শিক্ষা—অন্যায়ের প্রতিরোধ করিও না, প্রতিবেশীকে ভালবাস, কেহ তোমার এক গালে চড় মারিলে তাহার দিকে অন্য গালটি ফিরাইয়া দাও, তোমার ধনসম্পত্তি বিলাইয়া দিয়া দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ কর। ইয়োরোপের কোন্ দেশ, কোন্ জাতি এই শিক্ষা জীবনে গ্রহণ করিয়াছে? কিন্তু মহাত্মা গান্ধী যখন এই শিক্ষায় প্রভাবিত হইলেন, তখন তিনি যে তাঁহার নিজের জীবনকেই তদনুসারে গঠন করিতে অগ্রসর হইলেন শুধু তাহাই নহে, তিনি সমস্ত ভারতীয় জাতির জীবনে তাহা প্রয়োগ করিতে অগ্রসর হইলেন; এবং ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার নামে প্রচারিত তাঁহার অহিংসা ও দারিদ্র্যের আদর্শ ভারতের আপামর জনসাধারণকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে-ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে, জগতের অন্য কোন দেশেই তাহা সম্ভব হইত না। বহু দিনের মায়াবাদের শিক্ষা ভারতকে ইহার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু আধ্যাত্মিকতাকে জীবন হইতে বাদ দিয়া ইয়োরোপও যে সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছে তাহা নহে। তাহার জড়বাদী সভ্যতা আজ আপনার ভারে আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ভগবান্‌কে ছাড়িয়া মানব-জীবনের কোন অর্থই থাকে না, কোন সমস্যারই সমাধান

হয় না। ইয়োরোপ বাহ্যিক জীবন গঠনের অশেষ উপাদান সংগ্রহ করিয়াও প্রকৃত সুখশান্তি লাভ করিতে পারে নাই। তাই আজ আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রস্থল ভারতের দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার দ্বারা কেমন করিয়া যে জীবন-সমস্যার সমাধান হইতে পারে তাহা তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। যে আধ্যাত্মিকতার মূল শিক্ষা জগৎ মিথ্যা, তাহার দ্বারা জগতের কি উন্নতি সাধিত হইবে?

মায়াবাদ ও আধ্যাত্মিকতা

কিন্তু মায়াবাদ ও আধ্যাত্মিকতা এক জিনিষ নহে। এই কথাটি আজ স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার দিন আসিয়াছে। মায়াবাদ অধ্যাত্ম সত্যের কেবল একটা দিকের উপরেই বিশেষভাবে ঝোঁক দিয়াছে। মায়া শব্দের মূল ধাতুগত অর্থ, যাহা পরিমাপ করে, (মা, to measure), এবং প্রথমতঃ এই অর্থেই উহা ব্যবহৃত হইয়াছিল। ভগবান অনন্ত, অসীম, অপরিমেয়। যে শক্তির বলে তিনি সীমার মধ্যে নিজেকে প্রকট করিলেন, জীব ও জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইলেন, ভগবানের সেই শক্তিই মায়া নামে অভিহিতা, তাঁহার পরমা চিদ্‌শক্তি। তিনি দেশকালের অতীত, এক,

অদ্বিতীয়—তাঁহার মধ্যে ভেদ নাই, বিভাগ নাই। তিনিই আবার বহুরূপে, দেশকালে বিস্তৃত জগৎরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। কিন্তু, :যিনি অখণ্ড, তিনি কেমন করিয়া খণ্ডিত হইলেন? যিনি অসীম, তিনি কেমন করিয়া সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইলেন? যিনি সকল সম্বন্ধের, সকল ব্যবহারের অতীত, তিনি কেমন করিয়া এই সম্বন্ধময় ব্যবহারিক জগৎরূপে পরিণত হইলেন? ইহার এক উত্তর এই যে, তিনি বাস্তবিক এ-সব কিছুই হন নাই, কেবল মনে হয় যে তিনি এই রকম হইয়াছেন। তাহা হইলে এই জগৎপ্রপঞ্চ সত্য নহে, মিথ্যা। এই ভাবে "মায়া" শব্দের অর্থ দাঁড়াইল ভ্রান্তি, মিথ্যা, illusion। কিন্তু, বেদ, উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র, গীতা, কোথাও আমরা "মায়া" শব্দের এই ব্যাখ্যা দেখিতে পাই না। আচার্য্য শঙ্করই এই অর্থ বিস্তৃত ভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, নিগু´ণ, নিষ্ক্রিয়,—তাঁহার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি বা তাঁহার জগৎরূপে পরিণতি সম্ভব নহে। কিন্তু উপনিষদে ব্রহ্মকে যেমন নির্ব্বিশেষ নিগু´ণ নিষ্ক্রিয় বলা হইয়াছে, তেমনই আবার সবিশেষ, সগুণ, সক্রিয় বলা হইয়াছে। এই বিরোধের মীমাংসা কি? ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা আচার্য্য বাদরায়ণ ইহার সহজ মীমাংসা দিয়াছেন,

"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ",—শ্রুতিতে যখন ব্রহ্ম-সম্বন্ধে দুই প্রকার বর্ণনা আছে, তখন এই দুই প্রকারই সত্য, যদিও উহা আমাদের চিন্তার অতীত। ব্রহ্মের স্বরূপ অচিন্ত্য-স্বভাবযুক্ত, অতএব তাহাতে কোন বিরোধ থাকিতে পারে না। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর এই মীমাংসা স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম সবিশেষ এবং নির্ব্বিশেষ দুইই—ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ। তবে তিনিও শ্রুতিকে অমান্য করেন নাই, "মায়া" শব্দের স্বকীয় ব্যাখ্যার দ্বারা তিনি এই বিরোধের সামঞ্জস্য করিয়াছেন। ব্রহ্ম বস্তুতঃ নির্ব্বিশেষ নির্গুণ হইলেও মায়ার প্রভাবে তিনি সবিশেষ সক্রিয় বলিয়া প্রতিভাত হন, রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। কিন্তু শঙ্করের এই সিদ্ধান্ত অধ্যাত্ম-দৃষ্টিলব্ধ পরম সত্য নহে,—ইহা আংশিক উপলব্ধিকে ভিত্তি করিয়া মানসিক যুক্তিতর্কের সিদ্ধান্ত, অতএব ভ্রান্তিপূর্ণ। যিনি সর্ব্বশক্তিমান, অনন্ত, অসীম, তিনি যদি ইচ্ছামত নিজকে সীমার মধ্যে প্রকাশ করিতে না পারেন, এক হইয়াও বহু রূপে প্রকট হইতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার অসীমত্ব, absoluteness কোথায় থাকে? তিনি কি তাঁহার একত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়েন না? এক কি করিয়া বহু হইলেন তাহা আমরা সাধারণ মানসিক বুদ্ধির দ্বারা ধারণা করিতে না

পারিলেও, ইহা পরম সত্য। বেদ উপনিষদের ঋষিরা অত্যুচ্চ অধ্যাত্ম সাধনার বলে এই সত্য সাক্ষাৎভাবে দর্শন করিয়াছিলেন, তাই ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাঁহারা দুই রকম বর্ণনাই করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্ম নির্গুণোগুণী—ইহাই উপনিষদের মূল কথা। ব্রহ্ম সত্য, জগৎও সত্য। এক সত্য, বহুও সত্য। কেবল যখন বহুকেই চরম সত্য বলিয়া ধারণা হয়, ইহার পিছনে যে পরম ঐক্য রহিয়াছে তাহার উপলব্ধি না হয়, সেইটাই ভ্রান্তি, illusion, অজ্ঞান—এবং ইহা জগৎসৃজনকারিণী মায়ারই একটি ক্রিয়া। ব্রহ্ম ছাড়া জগতের অস্তিত্ব নাই, কিন্তু জগৎ মিথ্যা নহে। উপনিষদ বলিয়াছে, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম। গীতা বলিয়াছে বাসুদেবঃ সর্ব্বং, সকল জগৎই বাসুদেব। ব্রহ্ম সকল জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং, অথচ তিনি জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহেন, জগৎ অপেক্ষা তিনি অনন্ত গুণে বড়। জগৎ কেবল তাঁহার একটা আংশিক অভিব্যক্তি, একাংশেন স্থিতো জগৎ।

উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে আপাতবিরোধী যে-সব বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে, গীতা গভীর অধ্যাত্মোপলব্ধির ভিত্তিতে পুরুষোত্তমতত্ত্বের অবতারণা করিয়া সে সবের অপূর্ব্ব সমাধান করিয়াছে। ব্রহ্ম যখন জগৎরূপে

নিজেকে ব্যক্ত করিতেছেন তখন তিনি সবিশেষ, সগুণ, সক্রিয়,—গীতার ভাষায় ক্ষর পুরুষ। আবার অক্ষর পুরুষ রূপে তিনি জগৎলীলা হইতে সরিয়া রহিয়াছেন,—নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, নিষ্ক্রিয় সাক্ষীরূপে জগৎকে ধরিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু এই অক্ষরেরও উপরে রহিয়াছেন পুরুষোত্তম, উপনিষদের ভাষায় অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ। ক্ষর ও অক্ষর এই দুইই পুরুষোত্তমের মধ্যে দুইটি ভাব। পুরুষোত্তমই পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর, পরমাত্মা। তিনি জগতের বহু উৰ্দ্ধে, অনন্ত, অব্যক্ত, আবার তিনিই তাঁহার একাংশে জীব ও জগৎ হইয়াছেন, সকল জীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে বিরাজ করিতেছেন, যুগে যুগে মানবমূর্ত্তি ধরিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছেন, এই নশ্বর মানব দেহ প্রাণ মনই কেমন করিয়া দিব্য অধ্যাত্ম জীবনের আধার হইতে পারে, নিজের দৃষ্টান্তের দ্বারা জগৎকে সেই শিক্ষা দিতেছেন। এক ব্রহ্ম বা পুরুষোত্তমের মধ্যে এত বিভিন্ন বিরোধীভাবের সমাবেশ কেমন করিয়া হইল? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, শ্রুতিতে এইরূপই আছে। যাঁহারা অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারা উপযুক্ত দৃষ্টিলাভ করিবেন, নিজেদের মধ্যেই তাঁহারা এই সত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইবেন। ব্রহ্মের মধ্যে আছে অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যযোগ, অতএব এ-সব বিরোধ নহে, কেবল বিরোধের

আভাস মাত্র। সমগ্র দৃষ্টিলাভ করিলেই সব বিরোধের সামঞ্জস্য দর্শন করিতে পারা যায়।

এই জগৎলীলা, জীবনলীলাকে মিথ্যা বলিয়া ছাড়িয়া যাওয়া নহে, সকলের হৃদ্দেশে যে পুরুষোত্তম বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার সহিত সকল রকম মধুর সম্বন্ধ* স্থাপন করিয়া মানুষকে তাঁহার সাধর্ম্ম্য লাভ করিতে হইবে। ভিতরে থাকিবে অক্ষর পুরুষের শান্ত, নির্লিপ্ত, দ্রষ্টাভাব, বাহিরে ভগবানের যন্ত্ররূপে জগতে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে, তাঁহার কর্ম্ম সাধন করিতে হইবে, তাঁহার আনন্দলীলার রসাস্বাদন করিতে হইবে—ইহার জন্যই মর্ত্ত্যের মানবজীবন। ক্ষুদ্র অহংভাব বর্জ্জন করিতেই হইবে, ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ বাসনা-কামনার উপরে উঠিতেই হইবে, কিন্তু তাহার অর্থ নহে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হওয়া। যে অজ্ঞান অহংভাব আমাদিগকে জগতের আর সকল জীব হইতে, ভগবান হইতে পৃথক করিয়া রাখে সেইটিকেই নির্ম্মূল করিতে হইবে। মানুষ যখন উপলব্ধি করিবে যে, জগতের সকল মানুষই ভগবানের এক একটি অংশ, মমৈবাংশঃ সনাতনঃ, এক একটি রূপ, তাঁহার দিব্যশক্তির এক একটি বিশিষ্ট প্রকাশ, তখনই সে নিজের প্রকৃত

* পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ—গীতা

ব্যক্তিত্ব, ব্যষ্টিত্ব, individuality'র সন্ধান পাইবে। তখন সংসারের সকল মানুষের সঙ্গে সে নিগূঢ় ঐক্য উপলব্ধি করিবে, সকল দ্বন্দ্ব ও মোহের উপরে উঠিবে, তখনই ভূতলে স্বর্গরাজ্য, প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেক মানবের মধ্যে, ব্যষ্টির মধ্যে ভাগবতজীবনের যে অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে, নানা স্তরের সমষ্টি-জীবনের ভিতর দিয়া তাহার ক্রমবিকাশ হইবে,—যেমন ব্যক্তির জীবন, তেমনই সমষ্টির জীবন, সমাজের জীবন হইবে মানবজাতির মধ্যে ব্রহ্মেরই আত্মপ্রকাশ।

মর্ত্ত্যে দিব্যজীবন

একমাত্র ব্রহ্মই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই জগৎভ্রান্তি কোথা হইতে, কেমন করিয়া আসিল, মায়া কি বা কাহার, এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর মায়াবাদী দিতে পারেন না। মায়া আছে, অনন্তকাল ধরিয়া আছে, ব্রহ্মের মধ্যে জগতের ভ্রান্তি সৃষ্টি করিতেছে, ইহাই তাঁহাদের মত। কিন্তু তাহা হইলে অধ্যাত্মসাধনার উপযোগিতা কি? মুক্তি-লাভের অর্থ কি? জীব জ্ঞানলাভ করিয়া ব্রহ্মে লীন হইলেই বা তাহার পরিত্রাণ কোথায়? মায়া যে তাহাকে আবার জগৎভ্রান্তির মধ্যে টানিয়া আনিবে! যুক্তির দিক

দিয়াও অধিকতর সঙ্গত মতবাদ এই যে, মায়া ব্রহ্মের সেই অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি, যাহার দ্বারা ব্রহ্ম নিজেকে বহু-রূপে আস্বাদন করিবার জন্য জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, বেদের ভাষায় একোঽহম্ বহু স্যাম্। জগৎ ব্রহ্মের আংশিক অভিব্যক্তি হইলেও ইহা মিথ্যা নহে, ভ্রান্তি নহে, ইহা তাঁহার আনন্দলীলা। ব্রহ্ম আপনার আনন্দে আপনি পূর্ণ। যখন তিনি আনন্দের আদান-প্রদান করিয়া সেই আত্মানন্দকে অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া আস্বাদন করিতে চাহিলেন, তখনই হইল এই জগতের সৃষ্টি। এবং যে রহস্যের দ্বারা তিনি ইহা করিলেন, তাহারই বিভিন্ন নাম শক্তি, প্রকৃতি, মায়া। তাহা হইলে এই জীবনলীলাকে মিথ্যা বলিয়া ত্যাগ করিয়া যাইবার সার্থকতা কি? বরং যাহাতে এই লীলার পূর্ণতম বিকাশ হয়, সীমার মাঝে অসীমের দিব্য সুর বাজিয়া উঠে, তাহাই মানবজীবনের পরম লক্ষ্য।

তবে মায়াবাদীরা যে বলেন জগৎ মিথ্যা, ইহার মূলেও কিছু সত্য রহিয়াছে। জগৎ এখন যেমন, ইহার দিকে চাহিয়া কেহই বলিতে পারেন না যে, ইহা নিছক আনন্দ-লীলা। জগতে সুখ-সৌন্দর্য্যের যেমন অন্ত নাই, তেমনই দুঃখ-যন্ত্রণারও সীমা নাই। জগৎ যদি আনন্দময় ব্রহ্মের অভিব্যক্তি, তাহা হইলে এত দুঃখ কেন, শোক কেন, জরা

ব্যাধি মৃত্যু কেন ? বাস্তবিক যাঁহারা গভীরভাবে জগতের এই দুঃখময় সত্তা উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং অন্তর্মুখী হইয়া আত্মার মধ্যে পরম শান্তি ও আনন্দের সন্ধান পাইয়াছেন তাঁহারা এই জগৎকে মিথ্যা না বলিয়া পারেন না, যদি না তাঁহারা আরও একটি মহত্তর সত্যের সন্ধান পান যাহার দ্বারা এই জগৎকে রূপান্তরিত করিয়া আনন্দময় স্বরূপে পরিণত করা যাইতে পারে। ভারতের বৈদিক ঋষিরা সেই মহত্তর সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। আধুনিক জড়বিজ্ঞান অন্য দিক দিয়া সেই সত্যেরই কতকটা আভাস পাইয়াছে The Theory of Evolution বা ক্রমবিকাশবাদের মধ্যে। আধুনিক ক্রমবিকাশবাদ বলে, জড় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে প্রাণীজগৎ, প্রাণীজগৎ হইতে আসিয়াছে মানবজাতি— এইভাবে জগৎ ক্রমশঃ এক অপূর্ব্ব পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে। তাই আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন বলিতেছে ভগবান এই জগতের মধ্যে অনুস্যূত, immanent ; তিনি ক্রমশঃ অচেতন হইতে সচেতন হইতেছেন, অপূর্ণ হইতে পূর্ণ হইতেছেন, জগতে যত অশুভ, দুঃখ, সে-সবই ক্রমশঃ দূর হইবে, ক্রমশঃ জগৎ ও জীবন পূর্ণানন্দময় হইয়া উঠিবে, ভগবানেরও আত্মবিকাশ পূর্ণ হইবে। কিন্তু ভগবান্ অপূর্ণ ছিলেন পূর্ণ হইতেছেন, অচেতন ছিলেন সচেতন হইতেছেন,

এ-কথা কোন ধর্ম্মই স্বীকার করিতে পারে না। তাই পাশ্চাত্য দেশে আজও বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মে সামঞ্জস্য হইতেছে না, এবং ইহাই বর্ত্তমান সভ্যতা-সঙ্কটের মূল কথা। কিন্তু গীতা কর্ত্তৃক প্রচারিত উদার বৈদান্তিক সত্যের মধ্যে আমরা এই সকল তত্ত্বের পূর্ণ সামঞ্জস্যের সূত্রটি দেখিতে পাই। ভগবান পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম, তিনি সকল দেশ ও কালের অতীত, আপনাতে আপনি চির-পূর্ণ, সচ্চিদানন্দ। তাঁহাকে বিকাশধারার মধ্যে দিয়া নিজকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে হয় না, কিন্তু তাঁহার অংশ যে জীব তাহাই চলিয়াছে বিকাশের মধ্য দিয়া। জীবাত্মা প্রকৃতি হইতে ক্রমশঃ দেহ, প্রাণ, মনের বিকাশ করিতেছে, যেন ব্যষ্টির মধ্য দিয়া ভগবান নিজের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বিচিত্রভাবে প্রকাশ করিতে পারেন। যত দিন না এই বিকাশ পূর্ণতা লাভ করিতেছে, তত দিনই শোক-দুঃখ। নিজের অনন্ত দিব্য সম্ভাবনার একটি বিকাশ করিতে ভগবান্ জীবরূপে নিজেই স্বেচ্ছায় এই দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছেন। সকল সুখ-দুঃখ, শুভ-অশুভ, জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া নানা অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়া এবং আপন সত্তায় নিহিত ভাগবত অংশের বিকাশ করিয়া মানুষ ক্রমশঃ দিব্যজীবনের দিকে, অমৃতত্বের দিকে চলিয়াছে। এবং এই বিকাশলীলাকে ধরিয়া রহিয়াছে

ভগবানের পরা প্রকৃতি, যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ (গীতা) ; তাহা মায়া বা ভ্রান্তি (illusion) নহে। জগতের সর্ব্বত্র যে ভগবদ্‌সত্তা লুক্কায়িত রহিয়াছে, প্রকৃতি ক্রমশঃ তাহাই প্রকট করিতেছে। প্রকৃতির এই বিকাশলীলাই যোগ (Yoga), অতএব এক হিসাবে মানুষের সমগ্র জীবনই যোগ। কিন্তু মানুষ যখন সজ্ঞানে নিজের অন্তর্নিহিত ভগবদ্‌সত্তার পূর্ণ বিকাশের সাধনা করে, পরা প্রকৃতি বা পরমা চিদ্‌শক্তির ক্রিয়ার সহিত স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করে, সেইটিকেই বিশেষভাবে যোগসাধনা নামে অভিহিত করা হয়, এবং ইহা দ্বারা মানুষ অতি দ্রুত দিব্য-জীবন লাভ করিয়া পার্থিব লীলাকে সার্থক করিতে পারে।

সংসারের অনিত্যতা এবং দুঃখময়ত্ব উপলব্ধি করিয়া ভারতের দর্শনশাস্ত্রগুলি যখন সংসারত্যাগ, কর্ম্মত্যাগের শিক্ষা প্রচার করিতেছিল, সেই সময়ে গীতা সকল অধ্যাত্ম-সত্যের উৎস বেদ ও উপনিষদে ফিরিয়া গিয়া ব্রহ্ম ও জগৎ, আধ্যাত্মিকতা ও জীবন, নৈষ্কর্ম্ম্য ও কর্ম্ম, ত্যাগ ও ভোগ—ইহাদের মধ্যে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু, প্রথমতঃ বৌদ্ধগণের শূন্যবাদের প্রভাবে এবং পরে শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক তীব্রভাবে মায়াবাদের বিস্তৃত প্রচারের ফলে ভারত গীতার সে দিব্য শিক্ষার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ

করিতে পারে নাই। শঙ্করের শিক্ষার প্রভাবে এ-যুগে স্বামী বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, "গীতায় ভগবান যে নিষ্কাম কর্ম্ম করতে বলেন, সে পূজা, জপ, ধ্যান এই সব কর্ম্ম—অন্য কর্ম্ম নহে।" অথচ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ন্যায় ভীষণ কর্ম্মে অর্জ্জুনকে প্রবৃত্ত করাইবার জন্যই সমগ্র গীতা কথিত হইয়াছিল! শেষ পর্য্যন্ত সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেই হইবে, নতুবা মুক্তি নাই, যতদিন না দেহের পতন হয়, ততদিন কোন রকমে জীবন ধারণের জন্য যতটুকু কর্ম্ম না করিলে নয় কেবল তাহাই করিবে, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, কৌপীন ধারণ,—ইহাই মানবজীবনের চরম ও পরম আদর্শ বলিয়া শঙ্কর প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র গীতার মধ্যে এরূপ আদর্শের শিক্ষা আমরা কোথাও দেখিতে পাই না। অর্জ্জুন মোহের বশে এই আদর্শের দিকেই প্রথমে ঝুঁকিয়াছিলেন, ভগবান গীতার শিক্ষা দিয়া অর্জ্জুনের মোহ ভঙ্গ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের সে-মোহ আজও ভাঙ্গে নাই।

মানুষ যে অহংভাবের বশে, কাম, ক্রোধ, লোভের বশে পাশবিক, আসুরিক জীবন যাপন করিতেছে, গীতা ইহাকেই বলিয়াছে অনিত্যম্ অসুখম্ লোকম্, এই জীবনকে ছাড়াইয়া উঠিতেই হইবে। কিন্তু তাহার অর্থ নহে জীবনলীলাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ

ব্রহ্মের সহিত্য এক হইয়া যাওয়া। গীতায় মুক্তির এইরূপ অর্থ কোথাও নাই। মুক্তির স্বরূপ বুঝাইতে গীতা বলিয়াছে, ময্যেব নিবসিষ্যসি, আমার মধ্যে বাস করিবে, মম সাধর্ম্ম্য-মাগতাঃ, আমার সাধর্ম্ম্য লাভ করিবে। ভগবানের মধ্যে বাস করার অর্থ ভগবদ্ চৈতন্যের মধ্যে বাস করা, মানুষ এখন যে অজ্ঞান অবিদ্যার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, ত্রিগুণের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে ইহা হইতে মুক্ত হইয়া এক ঊর্দ্ধতন চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ইহার জন্য এই পার্থিব দেহ, এই পার্থিব জীবন ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। এইখানেই, ইহৈব, ভগবানের সহিত ঐক্যজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, সর্ব্বভূতের মধ্যে ভগবানকে দেখিতে হইবে, ভালবাসিতে হইবে, ভজনা করিতে হইবে। ভগবানের সহিত যে এইরূপ নিবিড় যোগ, নিবিড় ঐক্য লাভ করিয়াছে, সে যেখানেই থাকুক আর যাহাই করুক সর্ব্বদা ভগবানের মধ্যেই বাস করে—

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ গীতা ৬।৩১

মানুষ বর্ত্তমানে যে দুঃখময় জীবনের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, গীতা ইহাকেই মায়া বলিয়া অভিহিত করিয়াছে।

ইহা গুণত্রয়ের দ্বন্দ্বের জীবন, অহংভাব, বাসনা কামনার জীবন, এক কথায় অজ্ঞানের জীবন। ইহার উপরে উঠিয়া জ্ঞানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, নীচের মানবীয় প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করিয়া দিব্য ভগবদ্ প্রকৃতিতে পরিণত করিতে হইবে, ইহাই ভগবানের সাধর্ম্ম্য লাভ। ইহা ব্যতীত সাংসারিক দুঃখের বা মানবজীবনের কোন সমস্যারই প্রকৃত সমাধান হইতে পারে না। এই দুঃখময় অজ্ঞানময় মায়ার জীবন হইতে উদ্ধার পাইবার এক মাত্র পন্থা একান্তভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়া—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

গীতা সন্ন্যাসের নিন্দা করে নাই, কিন্তু বলিয়াছে ত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যাস। বাহিরে জীবন, কর্ম্ম, সুখ সম্পদ ত্যাগ নহে, ভিতরে আসক্তি, বাসনা, অহঙ্কার ত্যাগ। গীতা স্পষ্ট এই জগৎকে ভোগ করিবারই নির্দ্দেশ দিয়াছে—

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্।

ইহা কি দারিদ্র্যব্রতের শিক্ষা, সংসারত্যাগের শিক্ষা? এই পৃথিবীকে পূর্ণভাবে ভোগ করিতে হইবে, ভোক্ষ্যসে মহীম্, তবে সে যেন পাশবিক বা আসুরিক ভোগ না হয়,

ভগবান বিশ্বলীলায় যে আনন্দ আস্বাদন করিতেছেন, তাঁহার সাধর্ম্ম্য লাভ করিয়া, তাঁহার সখা, সাথী, প্রিয় হইয়া তাঁহারই মত জীবনকে দিব্যভাবে ভোগ করিতে হইবে—ইহাই মানবজীবনের নিগূঢ় লক্ষ্য ও অর্থ এবং এই তত্ত্বের উপলব্ধির মধ্যেই মানবজাতির, মানবসমাজের সকল সমস্যার সমাধান নিহিত রহিয়াছে।

জীবন ও যোগ

আজ এক মহান অগ্নি-পরীক্ষার যুগ আসিয়াছে, মানুষের আদর্শ, মানুষের চিন্তা, পরিকল্পনা, কর্ম্মধারা সব যাচাই হইতেছে, কোন্‌টি লুপ্ত হইবে, কোন্‌টি মানবজীবনের ভবিষ্যৎ সংগঠনে নূতন শক্তি, নূতন জীবন লইয়া অগ্রসর হইবে এখন তাহারই পরীক্ষা চলিতেছে। ভারতের যোগ-সাধনা হইতেছে এমনই এক শক্তি—মূলতঃ তাহা প্রকৃতির কতকগুলি মহতী শক্তির রূপায়ণ ও বিশিষ্ট ক্রিয়া। এই যোগের উৎপত্তি কবে হইয়াছিল তাহা কেহ জানে না, ইহার অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তির ও সত্যের বলেই ইহা আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছে। এত কাল ইহা সাম্প্রদায়িক গুহ্য তত্ত্বরূপে এবং হিমালয়ের গুহায় লুক্কায়িত ছিল, এখন মানবজীবন, মানবসমাজের সংগঠনে নিজস্থান গ্রহণ করিবার জন্য আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু প্রথমে ইহাকে নূতন করিয়া নিজেকে আবিষ্কার করিতে হইবে, ইহার যে নিগূঢ় অন্তর্নিহিত সত্য, প্রকৃতির যে চিরন্তন

লক্ষ্য সাধন ইহার ব্রত তাহা সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিতে হইবে এবং এই আত্মজ্ঞানের আলোকে মহত্তর উদারতর সমন্বয় সাধন করিতে হইবে। এই ভাবে পুনর্গঠিত হইলেই সে মানবসমাজে তাহার কাজ সহজে এবং সতেজে করিতে পারিবে, মানবজাতিকে তাহার অন্তরতম সত্যের দিকে এবং উর্দ্ধতম সত্যের দিকে লইয়া যাইতে সক্ষম হইবে।

জীবন ও যোগের যাহা প্রকৃত মর্ম্ম তাহাতে সকল জীবনই হইতেছে যোগ, সজ্ঞানেই হউক বা অজ্ঞানেই হউক। কারণ যোগ শব্দের দ্বারা আমরা বুঝি সত্তার মধ্যে যে-সকল সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে তাহাদের প্রকটনের দ্বারা পূর্ণ আত্ম-বিকাশের সুসম্বদ্ধ প্রণালী এবং মানুষের মধ্যে ও জগতের মধ্যে যে বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত ভাগবত সত্তা আংশিকভাবে প্রকট হইয়াছে তাহার সহিত ব্যষ্টিগত মানবের সংযোগ বা মিলন। কিন্তু যদি আমরা বাহ্যদৃশ্যের পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, সমস্ত জীবনই হইতেছে প্রকৃতির এক বিরাট যোগসাধনা, প্রকৃতি তাহার সম্ভাবনাসকলকে ক্রমবর্দ্ধিত ভাবে প্রকট করিয়া নিজ পূর্ণতা সাধনের প্রয়াস করিতেছে এবং তাহার নিজ ভাগবত সত্তার সহিত মিলিত হইবার প্রয়াস করিতেছে। যাহাতে এই মহান উদ্দেশ্য শীঘ্র এবং

সতেজে সিদ্ধ হয় সে জন্য সে পৃথিবীতে প্রথমে মানুষের মধ্যে সজ্ঞান প্রচেষ্টা এবং সঙ্কল্পমূলক কর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের কথায় যোগ হইতেছে মানুষের ক্রমবিকাশকে একই জন্মের মধ্যে, অথবা কয়েক বৎসরের মধ্যে, এমনকি কয়েক মাসের মধ্যেই দ্রুত সম্পূর্ণ করিয়া তোলা। অতএব কোন বিশেষ যোগপন্থা হইতেছে প্রকৃতির উদার, শ্লথ, দৃশ্যতঃ বহুল অপচয়মূলক পরন্তু সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বতোমুখী কর্ম্মধারারই নির্ব্বাচিত, সংক্ষিপ্ত ও অধিকতর শক্তিশালী বেগময় সংস্করণ। এই দৃষ্টি লইয়া যোগকে দেখিলেই বিভিন্ন যোগপন্থাসকলের সমন্বয় সাধনের সুদৃঢ় ও সন্তোষজনক ভিত্তি পাওয়া যাইতে পারে। কারণ তাহা হইলে যোগকে আর এমন এক দুর্ব্বোধ্য ও অস্বাভাবিক জিনিয বলিয়া মনে হইবে না যাহার সহিত সাধারণ জগৎ ব্যাপারের কোন সম্বন্ধ নাই, বিশ্বপ্রকৃতি অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের পূর্ণ বিকাশ করিয়া যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চায় তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। পরন্তু দেখা যাইবে, প্রকৃতি যে সকল শক্তি ইতিমধ্যেই প্রকট করিয়াছে অথবা ক্রমশঃ সুসম্বদ্ধ করিতেছে যোগ হইতেছে বস্তুতঃ সেই সকলেরই বিশিষ্ট শক্তিময় ও অসাধারণ প্রয়োগ।

বিজ্ঞান বিদ্যুৎ, বাষ্প প্রভৃতি বাহ্য প্রাকৃতিক শক্তি-সকলকে যে ভাবে কাজে লাগাইয়াছে যোগ কতকটা সেই ভাবেই মানুষের আভ্যন্তরীণ মানসিক শক্তিসকলকে কার্য্যে লাগাইয়াছে। সেজন্য বিজ্ঞানকে যেমন পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা প্রাকৃত তথ্যসকলের জ্ঞান সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, যোগকেও সেই ভাবে নিরন্তর পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা মানুষের অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, রাজযোগ এই জ্ঞান ও উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, সুনির্দ্ধারিত আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার দ্বারা চিত্তবৃত্তিসকলের নিরোধ বা লয় করা যাইতে পারে, তাহাদিগকে সুসংযত করিয়া নূতন নূতন জ্ঞান ও শক্তি লাভ করা যাইতে পারে। সেই রূপই হঠযোগ মূলতঃ এই জ্ঞান ও উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, আমাদের মধ্যে যে পঞ্চপ্রাণবায়ুর ক্রিয়া চলিতেছে, যাহারা আমাদের দেহের জীবনকে পরিচালিত করিতেছে—তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া এমন সব ক্রিয়ার বিকাশ করা যায় যাহা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে, কারণ তাহারা এই সকল প্রাণশক্তির নিগূঢ় রহস্য অবগত নহে। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি অন্যান্য যোগপন্থা অধ্যাত্ম সত্তা ও অধ্যাত্ম পরম আনন্দের অধিকতর নিকট-

বর্ত্তী, তথাপি তাহারাও প্রারম্ভে হৃদয় ও মনের কোন প্রধান ক্রিয়াকেই উন্নতভাবে প্রয়োগ করিয়া অগ্রসর হয়। যোগ শব্দের দ্বারা যে-সব প্রণালী বুঝায় সে-সবই হইতেছে বিশিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া, প্রকৃতির কোন সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যের উপরেই তাহাদের ভিত্তি, সাধারণ স্বাভাবিক ক্রিয়া-সকল হইতেই তাহারা এমন সব শক্তি ও সিদ্ধির বিকাশ করে যে-সব প্রকৃতির মধ্যে সকল সময়েই সুপ্ত ভাবে ছিল, তবে প্রকৃতির সাধারণ ক্রিয়ায় সেগুলি সহজে বা সচরাচর প্রকটিত হয় না।

কিন্তু বাহ্যপ্রকৃতির জ্ঞান বৃদ্ধির ফলে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াসকলের ক্ষেত্র বর্দ্ধিত হওয়ায় যেমন অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়, প্রকৃতির উপর আধিপত্য বাড়াইতে গিয়া নানা কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়, কলকব্জার বাহুল্যে আমা-দের সাধারণ মানবজীবন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে, একদিকে স্বাধীনতা লাভ করিতে গিয়া অন্যদিকে বশ্যতা বাড়িয়া যায়, তেমনই যোগ-সাধনার উপর এবং যোগসাধনালব্ধ নানা সিদ্ধির উপর ঝোঁক দেওয়াতে অসুবিধা ও ক্ষতি আছে, যোগীর প্রবৃত্তি হয় সাধারণ জীবন হইতে সরিয়া যাইতে ; সে জীবনের উপর আর তাঁহার ক্ষমতা থাকে না। তিনি তাঁহার মানবীয় জীবনধারাকে রিক্ত করিয়া অধ্যাত্ম সম্পদ

লাভ করিতে চান, বাহিরের মৃত্যুর মূল্য দিয়া ভিতরের স্বাধীনতা ক্রয় করিতে চান। যদি তিনি ভগবানকে লাভ করেন, তিনি জীবনকে হারান অথবা যদি তিনি বাহিরের দিকে ফিরিয়া জীবনকে জয় করিতে চান, তিনি ভগবানকে হারাইয়া ফেলিতে পারেন। সেইজন্যই আমরা ভারতে দেখিতে পাই সাংসারিক জীবন এবং অধ্যাত্ম বিকাশ ও সিদ্ধির মধ্যে একটা তীব্র অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হইয়াছে, আর যদিও ভিতরের আকর্ষণ এবং বাহিরের দাবী এই দুইয়ের মধ্যে সমুন্নত সামঞ্জস্যের আদর্শ ও প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে তথাপি কার্য্যতঃ ইহার দৃষ্টান্ত আজ পর্য্যন্ত দুর্লভই রহিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ যখন মানুষ তাহার দৃষ্টি ও প্রচেষ্টা অন্তর্মুখী করে এবং যোগের পথে প্রবেশ করে, তখন লোকে সমাজের মহান কর্ম্মক্ষেত্রে এবং মানবজাতির জীবনযুদ্ধে তাহার আশা একেবারেই ছাড়িয়া দেয়। এই ধারণাটি এমনই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, প্রচলিত দর্শন ও ধর্ম্মসমূহ ইহার উপরে এমন জোর দিয়াছে যে সকলেই মনে করে যোগসাধনা করিতে হইলে সাংসারিক জীবন ত্যাগ করিতেই হইবে, এমন কি ইহাই হইতেছে যোগ সাধনার উদ্দেশ্য। কোন যোগ-সমন্বয়ই সন্তোষজনক হইতে পারে না যদি তাহা

মুক্ত ও সিদ্ধ মানব জীবনে ভগবান ও প্রকৃতির পুনর্মিলন সাধনকে উদ্দেশ্য বলিয়া মনে না করে এবং আমাদের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য কর্ম্ম ও অনুভূতিসকলকে দিব্যভাবে রূপান্তরিত করিয়া তাহাদের পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধনকেই পদ্ধতি বলিয়া গ্রহণ না করে। কারণ মানুষ ঊর্দ্ধতর লোক হইতে ঠিক এই জন্যই জড়জগতে নামিয়া আসিয়াছে—তাহার মধ্যে নীচের জিনিসগুলিকে রূপান্তরিত করিয়া ঊর্দ্ধের স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে এবং ঊর্দ্ধের সত্তাও নিম্নতন রূপগুলির মধ্য দিয়া নিজেকে প্রকট করিতে পারে। সেই সম্ভাবনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্যই মানুষকে তাহার জীবন দেওয়া হইয়াছে—সেই জীবনকে পরিত্যাগ করা কখনই তাহার পক্ষে ঊর্দ্ধগতি লাভের জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় হইতে পারে না অথবা তাহার শ্রেষ্ঠ সাধনার লক্ষ্য হইতে পারে না, তাহার আত্ম-সিদ্ধি লাভের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী উপায় হইতে পারে না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে উহা সাময়িক ভাবে প্রয়োজনীয় হইতে পারে অথবা সমগ্র মানবজাতিকে কোন অত্যুচ্চ সম্ভাবনার দিকে আগাইয়া দিবার জন্য ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ঐরূপ বিশিষ্ট একান্ত প্রয়াস প্রয়োজনীয় হইতে পারে। যোগের সত্য ও পূর্ণ উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা কেবল তখনই সিদ্ধ

হইতে পারে যখন মানুষের সচেতন যোগসাধনা প্রকৃতির অবচেতন যোগসাধনার ন্যায় বাহ্যতঃ সমস্ত জীবনকেই নিজের ক্ষেত্র করিয়া লয় এবং সাধনা ও সিদ্ধি উভয় দিকেই লক্ষ্য করিয়া সার্থক ভাবে বলিতে পারা যায় যে, সমস্ত জীবনই হইতেছে যোগসাধনা, "All life is Yoga" *

* শ্রীঅরবিন্দের The Synthesis of Yoga হইতে সঙ্কলিত।

পৃথিবীতে নবতন্ত্র

হিট্‌লারের পরাজয় হইয়াছে, কিন্তু তাহার ধ্বংসের তাণ্ডব লীলায় একটি কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, ইউরোপকে সে যে-ভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহাতে ইউরোপ আর তাহার সেই প্রাচীন রূপ ফিরিয়া পাইবে না। আধুনিক সভ্যতা বলিতে ইউরোপীয় সভ্যতাই বুঝায়, বহুকাল ধরিয়া উহা সমগ্র জগৎকে প্রভাবিত করিয়াছে, কিন্তু সেই ইউরোপ আজ a dark continent, এক বিরাট অন্ধকারময় দেশ —তাহার আলো নিভিয়া গিয়াছে। আবার নূতন করিয়া যে আলো জ্বালা হইবে, তাহার শিখা কোথা হইতে আসিবে ? শুধুই যে যুদ্ধে সাতিশয় লোকক্ষয় হইয়াছে তাহা নহে, বিজিত দেশগুলি যাহাতে মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুবৎ দাসজাতিতে পরিণত হয় সেজন্য লক্ষ লক্ষ নরনারীকে নানারূপ আসুরিক উপায়ে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি সংস্কৃতি-মূলক অনুষ্ঠান ও শিক্ষক শ্রেণীকে বিনষ্ট করা হইয়াছে, অন্ন, বস্ত্র,

শিক্ষা, চিকিৎসার অভাবে গভীর নিরাশার অন্ধকারে সুদীর্ঘকাল বাস করিয়া ইউরোপের অধিকাংশ লোক বর্ব্বরতার সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইউরোপের এই নিদারুণ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকার সংবাদদাতা C. L. Sulzberger লিখিতেছেন—

"What can be done about Europe? It is the obligation of the world today to try to heal this wounded continent whose missionaries, whether cultural, religious, artistic or philosophical, have spread western civilisation to the far corners of the globe."

অর্থাৎ "ইউরোপকে লইয়া কি করা যায়? এতদিন এই ইউরোপের প্রচারকেরা দিক্‌দিগন্তে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার আলোক বিস্তার করিয়াছে—আজ সে আহত নির্জ্জিত—সমগ্র জগতের কর্ত্তব্য হইতেছে তাহাকে আবার সুস্থ করিয়া তোলা।"

কিন্তু কেন এমন হইল? ইউরোপের জীবন্ত শক্তিশালী প্রগতিশীল সভ্যতার মধ্যে কোথায় কি ত্রুটি ছিল যাহার জন্য তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুইটি বিরাট বিশ্ব-যুদ্ধের

অবতারণা করিল? আজও আমাদের দেশে যাহারা একটা নবতন্ত্র চাহিতেছেন তাহারা অনেকেই প্রকারান্তরে ঐ ইউরোপীয় সভ্যতারই অনুকরণ করিতে চাহিতেছেন—ভারতকে স্বাধীনতা ও সাম্য সম্বন্ধে ইউরোপীয় আদর্শে গড়িতে চাহিতেছেন—তাহার ত্রুটি কোথায় সেটির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে না। ইউরোপীয় সভ্যতার দোষ উহা বহির্মুখী—উহার নিরন্তর চেষ্টা হইতেছে সমাজ-যন্ত্রকে এমন ভাবে গড়িয়া তোলা যাহাতে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা যেন আপনা আপনি কলে প্রস্তুত হইয়া বাহির হয়। এই যান্ত্রিক মনোভাব গঠনের জন্য প্রধানতঃ দায়ী হইতেছে পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান। তাহা বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্য দেখে না, দেখিতে পারে না, তাহা শুধু বাহিরের আচরণটি দেখে এবং তাহা দেখিয়াই কতকগুলি ব্যবহারিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়—বাহ্য জীবন গঠনে সে-সব সিদ্ধান্ত অনেকখানি ফলপ্রসূ হইলেও তাহাদের দ্বারা কোন জিনিষের চরম মীমাংসা পাওয়া যায় না, মানবজীবনের নিগূঢ় সত্যে উপনীত হওয়া যায় না—আর যতক্ষণ না মানবের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন সেই নিগূঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ততক্ষণ কোন সমস্যারই সন্তোষজনক সমাধান হইবে না—মানবজীবন দুঃখ দ্বন্দ্ব ও অশান্তিতে পূর্ণ থাকিবে। স্বাধীনতা, সাম্য,

মৈত্রীর আদর্শ খুবই উচ্চ—কিন্তু আগে তাহাদের প্রতিষ্ঠা চাই অন্তর্জীবনে, তবেই তাহারা বাহ্যজীবনে সত্য হইয়া উঠিতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে শ্রীঅরবিন্দ *Arya* পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন,

"The root of the whole difficulty is ignored, that nothing can be real in life that is not made real in the spirit. It is only if men can be made free, equal and united in spirit that there can be a secure freedom, equality and brotherhood in their life. The idea and sentiment are not enough, for they are incomplete and combated by deepseated nature and instinct, and they are besides inconstant and fluctuate. There must be an immense advance that will make freedom, equality and unity our necessary internal and external atmosphere. This can come only by a spiritual change and the intellect of Europe is beginning to see that the spiritual change is at

least a necessity; but it is still too intent on rational formula and on mechanical effort to spare much time for discovery and realisation of the things of the spirit."

অহিংসা, শান্তি, স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী এই সব সম্বন্ধে শুধু আদর্শবাদ বা ভাবালুতা থাকাই যথেষ্ট নহে, মানব প্রকৃতিতে বদ্ধমূল অনেক প্রবৃত্তি এই সব উচ্চ আদর্শের বিরোধী; শুধু প্রচার কার্য্যের দ্বারা সে-সব প্রবৃত্তি নির্মূল হইবে না—চাই ব্যাপক আধ্যাত্মিক প্রভাব, আধ্যাত্মিক বাতাবরণ—আধ্যাত্মিকতার দিকে মানুষকে অনেকখানি অগ্রসর হইতে হইবে, তবেই মানব জাতির এই সব মহান স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইবে। ইউরোপ এই সত্যটি উপলব্ধি করিতে, আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে—কিন্তু বাহ্য সংগঠন লইয়াই সে এত ব্যস্ত যে এই সব নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান করিবার অবসর তাহার জুটিতেছে না।

সে কার্য্য করিতে হইবে এসিয়াকে, বিশেষতঃ ভারতকে। ইউরোপ যেমন বাহিরের জীবনকে সুগঠিত করিবার দিকে ঝোঁক দিয়াছে, ভারত স্মরণাতীত কাল হইতে তেমনই অন্তর্জীবনের দিকে ঝুঁকিয়াছে। এমন কি ভারতে অনেকেই

এই মত প্রচার করিয়াছেন যে, মানুষের বাহ্য জীবনের প্রকৃত সংস্কার বা উন্নতি সাধন অসম্ভব, এদিকে চেষ্টা কেবল কুকুরের লেজকে সোজা করিবার চেষ্টার মত পণ্ডশ্রম। যতক্ষণ মানুষ অন্ধ আসক্তির বশে ঐ জীবন ছাড়িতে পারিবে না, ততক্ষণ সে সেখানে থাকুক, তাহার জন্য যতদূর সম্ভব সুশৃঙ্খল জীবনের ব্যবস্থা করা হউক, তবে সে ব্যবস্থার লক্ষ্য থাকিবে যেন মানুষ ঐ জীবনের অসারতা বুঝিয়া যত শীঘ্র সম্ভব উহাকে ত্যাগ করে, অন্তর্জীবনের, আত্মার, ভগবানের সন্ধান করে।

গীতার বিখ্যাত কথা ঃ—

অনিত্যং অসুখং লোকং ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।

মানব জাতির উত্থান পতনের ইতিহাস যদি পর্য্যালোচনা করা যায়, বিশেষতঃ বাহ্যজীবনকে সুগঠিত করিবার বিপুল প্রয়াস করা সত্ত্বেও ইউরোপের আজ কি দশা হইল তাহা যদি পর্য্যালোচনা করা যায় তাহা হইলে মনে হইতে পারে যে বৈরাগ্যমূলক এই মতটাই সত্য। যতক্ষণ সংসার ছাড়িতে পারিতেছ না, সংসারের তুচ্ছ সুখদুঃখ লইয়াই থাকো, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে বৈরাগ্যের উদয় হইবে—তখন আর বিলম্ব নহে, তৎক্ষণাৎ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবে, —যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ। কিন্তু বস্তুতঃ

কয়জন লোকের এইরূপ বৈরাগ্য উদয় হইতেছে ? আর যাহারা আত্মার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছে তাহাদের মধ্যে কয়জনই বা কৃতকার্য্য হইতেছে ? সিদ্ধিলাভ করিতেছে ?

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

—গীতা ৭।৩

"হাজারো লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেহ অধ্যাত্ম সিদ্ধির জন্য প্রযত্ন করে। প্রযত্নকারী সিদ্ধদের মধ্যেও কদাচিৎ কেহ আমাকে (ভগবানকে) বাস্তবিক জানে।"

অধ্যাত্ম চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে সকল রকম বাসনা, কামনা, আসক্তিকে বর্জ্জন করিতে হয়, অন্তর্মুখী হইয়া নিরন্তর অভ্যাস করিয়া অন্তরের মধ্যে আত্মাকে, ভগবানকে লাভ করিতে হয়, ইহা মোটেই সহজ নহে—আর যাহারা এই সিদ্ধিলাভ করেন তাঁহারা আত্মার মধ্যেই যে শান্তি, পূর্ণতা, আনন্দ লাভ করেন তাহাতে তাঁহারা আর এই শতদোষত্রুটিপূর্ণ দুঃখদ্বন্দ্বময় সাংসারিক জীবনে ফিরিতে চান না। তাঁহারা যদি জগতের হিত করিতে চান, তাঁহাদের কাজ হয় মানুষকে এমন শিক্ষা দেওয়া যেন তাহারাও সংসার ত্যাগ করিয়া আত্মানন্দে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তাহা হইলে আধ্যাত্মিকতার দ্বারা মানবজীবনের

সমস্যাসকলের সমাধান কেমন করিয়া হইবে? মানুষের সমাজ, রাষ্ট্র, কেমন করিয়া সুগঠিত হইয়া তাহার বাহ্য-জীবনের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ করিয়া দিবে? আর জীবনকে ত্যাগ করিয়া যাওয়াই যদি আধ্যাত্মিকতার চরম বাণী হয়, আধুনিক মানব তাহা গ্রহণ করিবে না, যেমন এতদিন ছিল তেমনই এখনও অধ্যাত্ম প্রয়াস এখানে সেখানে দুই চারিজন লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। অন্য দিকে আবার স্পষ্টভাবেই দেখা গেল যে শুধু জড়বাদের দ্বারা মানবজীবনের পূর্ণতা সাধন করা যায় না।

শ্রীঅরবিন্দ এই সমস্যার সমাধান পাইয়াছেন অধ্যাত্ম বিবর্ত্তনবাদে (spiritual evolution)। তাঁহার The Life Divine গ্রন্থে তিনি সূক্ষ্মতম দার্শনিক বিচারের দ্বারা এই মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তবে তাঁহার নিকটে ইহা শুধুই একটি দার্শনিক মতবাদ বা থিওরী (theory) নহে—ইহা তাঁহার সুদীর্ঘ যোগসাধনলব্ধ প্রত্যক্ষ ও দিব্য সত্য এবং এই সত্যকে ধরিয়াই পার্থিব মানবজীবন পূর্ণতা লাভ করিবে। যাঁহারা বলেন মানব জীবনের মূলগত উন্নতিসাধন অসম্ভব, তাঁহাদের মতের মধ্যে এই সত্য রহিয়াছে যে, ক্রমবিবর্ত্তনের ধারায় মানুষ যে স্তরে উঠিয়াছে, জড়াশ্রিত প্রাণের আধারে মন ও বুদ্ধির

বিকাশ করিয়াছে, মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতাঃ,—যতক্ষণ না মানুষ ইহার ঊর্দ্ধে আর এক স্তরে উঠিতেছে, অতিমানস চৈতন্য লাভ করিয়া অতিমানব (Superman) না হইতেছে তত দিন মানবজীবনের মূলগত কোন পরিবর্ত্তন বা উন্নতি সম্ভব হইবে না—মানুষের জীবন এখন যেমন চলিতেছে, দুঃখ, দ্বন্দ্ব, অশান্তির ভিতর দিয়া জীবনের বিচিত্র বিকাশ ও অনুভূতি, একটু আধটু বাহ্যিক ঘোরফের করিয়া সেই রকমই চলিতে থাকিবে। কিন্তু পৃথিবীতে মানব-জীবনের ইহাই ভবিতব্যতা নহে, ক্রমবিবর্ত্তনের শেষ সীমান্ত মানুষ নহে—সেই বিবর্ত্তনের ধারাতেই মানুষ হইবে অতিমানব এবং যাহাতে মানুষ এই অতিমানস স্তরে উঠিতে পারে তাহার জন্য প্রয়াস করাই হইতেছে মানুষের প্রকৃত কাজ ও সাধনা। জার্ম্মান দার্শনিক নীট্‌শের ভাষায়,

"The Superman is the meaning of the earth. Let your will say : The Superman shall be the meaning of the earth. Upward goes our way from species to super-species."

কিন্তু মানুষ এই অতিমানব স্তরে উঠিবে কেমন করিয়া ? নীট্‌শের দেশ জার্ম্মানী অতিমানবতার বিকাশ করিতে

গিয়া আসুরিকতা ও পৈশাচিকতারই বিকাশ করিয়াছে। বোধ হয় ইহা অনিবার্য্য ছিল—কারণ মানুষ এখন যে অজ্ঞান মানসচৈতন্যের মধ্যে বাস করিতেছে তাহাতে তাহাকে অনেক ভুলভ্রান্তির ভিতর দিয়া অনেক আঘাত খাইতে খাইতেই অগ্রসর হইতে হয়। নীট্‌শের ধারণা ছিল শুধু স্থূল শক্তির উচ্চতম বিকাশ করিয়াই মানুষ অতিমানব হইবে—হিট্‌লারের অধীন জার্ম্মানী সেই তুরন্ত প্রয়াস করিতে গিয়া নিজের উপর যে সর্ব্বনাশ ও অভিশাপ ডাকিয়া আনিয়াছে আশা করা যায় ইহা হইতে সমগ্র মানবজাতি অবহিত ও সাবধান হইবে। একমাত্র আধ্যাত্মিকতার বিকাশ করিয়াই মানুষ অতিমানব বা দেবমানব হইতে পারে। এতদিন যে অধ্যাত্ম সাধনা চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে সাধক বাহ্যজীবন হইতে নিজেকে সংহৃত করিয়া অন্তরের মধ্যে আত্মার সন্ধান করে, আত্মার সচ্চিদানন্দ সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অতিমানব হইতে হইলে এইটি হইতেছে প্রথমেই প্রয়োজন—কিন্তু শুধু এইখানেই বিরত হইলে মানুষ হইবে অধ্যাত্মমানব (spiritual man), অতিমানব (superman) নহে। ভিতরের অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠা হইতে বাহ্যজীবনকে, দেহ, প্রাণ, মনকে যখন দিব্যভাবে রূপান্তরিত করা হইবে তখনই

অধ্যাত্মমানব হইবে অতিমানব এবং তাহাই প্রকৃত দিব্যজীবন,—The Life Divine.

যোগসাধনা বা অধ্যাত্মসাধনার ফলে ইতিপূর্ব্বে ব্যক্তিগতভাবে যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহারা হইয়াছেন অধ্যাত্মমানব—এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে প্রকৃতি ক্রম-বিবর্ত্তনের ধারায় মানবজাতিকে যে স্তরে তুলিতে চায়—অধ্যাত্মমানবগণ হইতেছেন তাহারই পূর্ব্বাভাষ। এই বিবর্ত্তন ঘটিবে প্রকৃতিরই ধারায় ঊর্দ্ধ হইতে অতিমানস সত্তার অবতরণের ফলে। ইতিপূর্ব্বে পার্থিব জীবনে বিবর্ত্তন এই ভাবেই ঘটিয়া আসিয়াছে। এই পৃথিবীতে এক সময়ে প্রাণের চিহ্নও ছিল না। প্রকৃতিজাত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে সমুদ্রের মধ্যে জড়পদার্থ যখন এমন অবস্থায় উপনীত হইল, কার্ব্বন কম্পাউণ্ড (Carbon Compound) সকল গড়িয়া উঠিল যাহাতে প্রাণের প্রকাশ হইতে পারে, তখন ঊর্দ্ধে প্রাণজগৎ (vital) হইতে প্রাণসত্তা নামিয়া আসিয়া এই জড়জগতে প্রাণের প্রতিষ্ঠা করিল। প্রথমে তাহা ছিল খুবই ক্ষীণ এবং সীমাবদ্ধ প্রকাশ—ক্রমশঃ তাহাই এই পৃথিবীকে শস্যশ্যামলা এবং অসংখ্যপ্রকার জীবজন্তুতে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এমনই করিয়া একদিন

ঊর্দ্ধ হইতে মানস শক্তির অবতরণের ফলে পৃথিবীতে মানবের আবির্ভাব হইয়াছে। এখন আবার আর এক মহান রূপান্তরের সন্ধিক্ষণ আসিয়াছে—ঊর্দ্ধ হইতে অতিমানস সত্তা পৃথিবীর উপর ক্রিয়া করিতেছে। যে সকল মানব অধ্যাত্মভাবে প্রস্তুত হইয়া উঠিবে তাহাদের মধ্যেই ঐ অতিমানস সত্তা অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীতে অতিমানবের প্রথম সূচনা করিবে। এবং একবার উহা প্রতিষ্ঠিত হইলে ক্রমশঃ উহা এই পৃথিবীতে মানব অপেক্ষা উচ্চতর এক শ্রেণী বা জাতি সৃষ্টি করিবে। তখনই পার্থিব বিবর্ত্তন তাহার চরম পরিণতি লাভ করিবে।

শ্রীঅরবিন্দ দেখাইয়াছেন এই যে অতিমানস রূপান্তর, এই যে মানুষের মধ্যে মনেরও ঊর্দ্ধে এক অতিমানস বা বিজ্ঞানশক্তির বিকাশ ইহা সহসা এক দিনে হইবে না, মন হইতে অতিমানসে উঠিতে অনেক স্তর বা পৈঠা অতিক্রম করিতে হইবে। মন ও অতিমানসের মধ্যে প্রধান কয়েকটি স্তর হইতেছে—Higher Mind (ঊর্দ্ধতন মন), Illumined Mind (জ্ঞানদীপ্ত মন), Intuition (বোধি), Overmind (অধিমানস)। এখানে এই সব স্তরের বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। শুধু এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, এক একটি স্তরের বিকাশের ফলে

মানুষের দেহ প্রাণ মনের এখন যে-সব দোষ, ত্রুটি. অপূর্ণতা আছে সে-সবের প্রতিকার হইবে—মানুষের মধ্যে জ্ঞানের, কর্ম্মের, প্রেমের, আনন্দের নূতন নূতন শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশ হইবে। এই ভাবে যখন অতিমানসের বিকাশ হইবে তখনই হইবে পৃথিবীতে এই জড়দেহেই দিব্যজীবন। কিন্তু তখন এই জড়দেহ আর এখনকার মত তামসিক নিশ্চেতন থাকিবে না—তাহারও সুপ্ত চৈতন্যের অভিনব বিকাশ হইবে। এই দেহও জরা ব্যাধি মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া ঊর্দ্ধতন জ্ঞান, শক্তি, প্রেমকে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, অন্তর্মুখী হইয়া আত্মাকে লাভ করা, অধ্যাত্মমানব হওয়াই কঠিন, বহু সাধনা সাপেক্ষ। তাহারও ঊর্দ্ধে বহু স্তর অতিক্রম করিয়া অতিমানব হওয়া কি সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হইবে? ইহা কি practical politics? আর যদিও ইহা সম্ভব হয়—তাহা হইলেও কি এই সব সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে যুগ যুগান্তর লাগিবে না? তাহা লাগিত, যদি মানুষকে নিজের চেষ্টাতেই ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে হইত। কিন্তু আজ মানুষকে আধ্যাত্মিকতা লাভের জন্য যে কঠিন প্রয়াস করিতে হইতেছে—পৃথিবীতে একবার অতিমানস সত্তা অবতীর্ণ হইলে সমগ্র পার্থিব জীবনের উপর তাহা যে প্রভাব বিস্তার করিবে তাহাতে

সে প্রয়াস আর ঐরূপ কঠিন বা জটিল থাকিবে না—আজ যাহা দুরূহ মনে হইতেছে তখন তাহা সহজ ও সুগম হইয়া উঠিবে। শুধু অধ্যাত্ম সাধনায় নহে, সাধারণ মানবজীবনেও সেই মহতী ভাগবতী শক্তির অবতরণের প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে। আজ জগতে সর্ব্বত্র দ্বন্দ্ব, সংঘাত, অন্ধ অন্বেষণ—কখনও অস্বাভাবিক উৎসাহ উত্তেজনা; কখনও হতাশা, এক সংঘাতের শেষ হইতেছে তাহা হইতে আবার নূতন সংঘাতের উদ্ভব হইতেছে—মানুষ অনবরত পরস্পরকে ভুল বুঝিয়া নিত্য নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে। ভগবৎ কৃপায় মানুষের সম্মুখে বার বার কতই সুযোগ আসিতেছে, কিন্তু অজ্ঞানের বশে মানুষ তাহা কাজে লাগাইতে সক্ষম হইতেছে না। মানবজাতির দুঃখ দ্বন্দ্বেরও অবসান হইতেছে না। একবার পৃথিবীতে অতিমানস সত্তা অবতীর্ণ হইলে তাহার ব্যাপক প্রভাবে এই সবেরই প্রতিকার হইবে বলিয়া আশা করা যায়—মানুষ অপেক্ষাকৃত সুশৃঙ্খল ভাবে, সুখে ও শান্তিতে ভগবদ্‌নির্দ্দিষ্ট দিব্যজীবনের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। এই কথাই শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার অনবদ্য ভাষায় The Life Divine গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"An incidence, a decisive stress would affect the life of the lower evolutionary

stages ; something of the light, something of the force would penetrate downwards and awaken into a greater action the hidden Truth-Power everywhere in Nature. A dominant principle of harmony would impose itself on the life of the Ignorance; the discord, the blind seeking, the clash of struggle, the abnormal vicissitudes of exaggeration and depression and unsteady balance of the unseeing forces at work in their mixture and conflict, would feel the influence and yield to a more orderly pace and harmonic steps of the development of being, a more revealing arrangement of progressing life and consciousness, a better life order. A freer play of intuition and sympathy and understanding would enter into human life, a clearer sense of the truth of self and things, and a more enlightened dealing with the opportunities and diffi-

culties of existence." (pp. 1030-31). "The gnostic consciousness in him (the supramental gnostic being) would perceive and bring out the evolving truth and principle of harmony hidden in the formations of the Ignorance ; it would be natural to his sense of integrality and it would be within his power to link them in a true order with his own gnostic principle and the evolved truth and harmony of his own greater life-creation. That might be impossible without a considerable change in the life of the world, but such a change would be a natural consequence of the appearance of a new Power in Nature and its universal influence. In the emergence of the gnostic being would be the hope of a more harmonious evolutionary order in terrestrial Nature." (p. 1033).

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা যোগসাধনালব্ধ দিব্যদৃষ্টিতে দেখি-

য়াছেন, এই অতিমানস ভাগবতসত্তা পৃথিবীর উপর এখনই অবতীর্ণ হইবার সুযোগ খুঁজিতেছে, দূর হইতে তাহারই প্রভাব পার্থিব জীবনের উপর পড়িয়াছে, তাই মিথ্যার অনুচর আসুরিক শক্তিসকল মানবজাতির এই অপূর্ব্ব সুযোগকে নষ্ট করিয়া দিবার জন্য দৃঢ়সংকল্পের সহিত প্রবৃত্ত হইয়াছে—তাই আজ জগৎব্যাপী মহাবিপ্লব—ইহা এক মহান যুগান্তরেরই সূচনা করিতেছে। যাহাতে এই শক্তি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই হইতেছে আজ মানুষের পক্ষে প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কাজ—কারণ একবার ইহা সিদ্ধ হইলে, একবার অতিমানস-সত্তার প্রভাবে কোথাও অতিমানবের আবির্ভাব হইলে নব বসন্ত সমাগমে যেমন মলয় সমীর বহিতে থাকে, সর্ব্বত্র তরুলতা আপনি মঞ্জরিয়া উঠে তেমনই অতিমানস অবতরণের প্রভাবে যে ব্যাপক অধ্যাত্ম বাতাবরণের আবির্ভাব হইবে তাহাতেই পৃথিবীতে মানবজীবনে সত্যই নবতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে।

কতকগুলি নরনারী যদি কেন্দ্রীভূত একাগ্র সাধনায় অতিমানসের জন্য অভীপ্সা জাগাইয়া রাখে এবং সকল প্রকার অজ্ঞানমূলক ও বাসনাত্মক অহংবোধ বর্জ্জন করিয়া নিজদিগকে সম্পূর্ণভাবে জগন্মাতার নিকট সমর্পণ করিতে

পারে তাহা হইলে তাহাদের আধারেই এই পার্থিব জীবনে অতিমানস সত্তা আবির্ভূত হইবে এবং তাহাই যুগান্তকারী বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করিয়া মানবীয় সমস্যা সকলের চরম মীমাংসার পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে। ইহা ছাড়া আর অন্য কোন পন্থাই নাই এবং ইহাই হইতেছে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের যোগসাধনার নিগূঢ় রহস্য।

জগতে আজ নানা আদর্শের কোলাহল—লোকে আপন আপন মত অপরের উপর জোর করিয়া চাপাইতে চাহিতেছে তাই বিশ্বব্যাপী অশান্তি। সকল মতবাদের মধ্যেই কিছু সত্য থাকিলেও কোনটিই পূর্ণ সত্য নহে—আর কোন একটিমাত্র মতবাদকে ধরিয়াও মানবীয় ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না। চাই মানবজাতির ব্যাপক অধ্যাত্ম উদ্বোধন—অতএব সকল রকম চরমনীতি পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বত্র যাহাতে আপোষ হয়, বৃথা দ্বন্দ্ব ও কোলাহলের দ্বারা দ্বেষবিদ্বেষ বর্দ্ধিত করা না হয়, মানব জীবনের যেটি মূল সত্য, মানবতার মধ্যে অতিমানবতার আবির্ভাব, এইটিকে সকলে দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারে—তাহাই হইতেছে বর্ত্তমানে ভারতবাসীর প্রতি, জগৎবাসীর প্রতি শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার বাণী। তাঁহারা যে বাণী দিয়াছেন তাহাতে জার্ম্মানীর অতিমানববাদ, সোভিয়েট রুশিয়ার

সাম্যবাদ, ইংলণ্ড, আমেরিকা ফ্রান্সের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, এশিয়া ও ভারতের অধ্যাত্মবাদ—সবেরই সমন্বয় হইয়াছে, কারণ ইহাদের অন্তর্নিহিত সত্য ঐ বাণীর মধ্যেই রহিয়াছে। অতএব এই বাণীকে অবলম্বন করিয়াই মানবজাতি স্থায়ী ঐক্য ও শান্তির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

বিবর্ত্তনের তিনটি স্তর

যোগসাধনার ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে উহা বিভিন্ন বিশিষ্ট ধারায় বিকাশলাভ করিয়াছে; প্রকৃতির অন্যান্য সকল জিনিষেরই ন্যায় ইহারও উপযোগিতা আছে, এমন কি অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা আছে। এইভাবে যে সব বিভিন্ন যোগ-প্রণালীর বিকাশ হইয়াছে, আমরা চাই তাহাদের একটা সমন্বয় করিতে। কিন্তু আমাদের এই প্রয়াসকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে হইলে প্রথমেই আমাদের বুঝিতে হইবে, এই যে প্রণালীর বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য ইহার মূলে কি নীতি, কি প্রেরণা রহিয়াছে; দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে কোনও বিশেষ যোগ-পদ্ধতি কি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহার প্রণালীর বিকাশ করিয়াছে। সাধারণ নীতিটির সন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে বিশ্বপ্রকৃতির সাধারণ কর্ম্মধারার পরিচয় লইতে হইবে; স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রকৃতি শুধুই একটা মিথ্যাময়ী মায়ার ছলনা মাত্র নহে, পরন্তু উহা হইতেছে

ভগবানেরই বিশ্বশক্তি, এক অনন্ত অথচ সূক্ষ্মতম দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞান অনুসারে উহা বিশ্বমাঝে ভগবানকেই প্রকট করিতেছে, প্রজ্ঞা প্রসৃতা পুরাণী, সৃষ্টির আদি হইতেই সেই ভাগবত প্রজ্ঞা বিশ্বের সকল কর্ম্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। আর কোনও বিশেষ যোগ-প্রণালীর বিশিষ্ট উপযোগিতা কি, তাহা বুঝিতে হইলে যোগের বিভিন্ন প্রণালীসকল আমাদিগকে সূক্ষ্মদৃষ্টি লইয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে, তাহাদের নানা বহিরঙ্গের অন্তরালে কি মূলনীতি রহিয়াছে, কোন্ মূলশক্তি তাহাদের পদ্ধতিকে ফলপ্রদ করিয়া তুলিতেছে তাহা বুঝিতে হইবে। তাহার পর আমরা অপেক্ষাকৃত সহজেই ধরিতে পারিব কোন্ একটি সাধারণ নীতি, কোন্ একটি সাধারণ শক্তি সকল প্রণালীরই মূলে বর্ত্তমান রহিয়াছে, কোন্‌টির দিকে সকলেই অজ্ঞাতসারে অগ্রসর হইয়াছে—সেইটিকে ধরিয়াই সকল প্রণালী জ্ঞাতসারে মিলিত হইতে পারিবে।

আধুনিক ভাষায় যাহাকে ক্রমবিবর্ত্তন (Evolution) বলা যায়, তাহা হইতেছে বস্তুতঃ মানুষের মধ্যে প্রকৃতির ক্রমবর্দ্ধমান আত্মপ্রকাশ ; এই ক্রমবিবর্ত্তনের ধারায় পর পর তিনটি স্তর অবশ্যম্ভাবী—যাহা ইতিপূর্ব্বেই বিকশিত হইয়াছে, যাহা বর্ত্তমানে জ্ঞাতসারে বিকশিত হইতেছে এবং

অতঃপর যাহার বিকাশ করিতে হইবে। শেষেরটি বোধ হয় ইতিমধ্যেই দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, কচিৎ কখনও হয়ত তাহা বর্ত্তমান মানবীয় সম্ভাবনার চরম সীমার নিকটবর্ত্তীই হইয়াছে। কারণ প্রকৃতির গতি নিয়মিত পদক্ষেপে অগ্রসর হয় না, যন্ত্রের মত তাহা একেবারেই বাঁধাধরা পথে চলে না। কখনও বা সে অনেকখানি আগাইয়া যায়, আবার তাহাকে বিপর্য্যস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। কখনও সে দৌড়ায়; কখনও আশ্চর্য্যময় ও শক্তিপূর্ণ ভাবে বাধাসকলকে চূর্ণ করিয়া দেয়, বিরাট সিদ্ধির বিকাশ করে। সে সুতীব্র আবেগের সহিত দ্রুত সম্মুখে ধাবমান হয়, যেন জোর করিয়াই স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া লইবে। তাহার ভিতরে দিব্য বা আসুরিক যে-সব সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে—এই সব আত্ম-অতিক্রমনের চেষ্টা হইতেছে তাহারই নিদর্শন; সে-সব দিব্যই হউক, আসুরিকই হউক, তাহাদের ভিতর দিয়াই সে তাহার লক্ষ্যের দিকে প্রবলভাবে অগ্রসর হয়।

প্রকৃতি আমাদের মধ্যে যাহার বিকাশ সম্পন্ন করিয়াছে এবং দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহা হইতেছে আমাদের দৈহিক জীবন। এই পৃথিবীতে আমাদের কর্ম্ম ও উন্নতির জন্য যে দুইটি জিনিষ নিম্নতন হইলেও মূলতঃ প্রয়োজনীয়

—জড় ও প্রাণ, প্রকৃতি সেই দুইটির মধ্যে একটি সংযোগ ও সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছে। উগ্র অধ্যাত্মবাদীরা জড়ের যতই নিন্দা করুন, জড়ই হইতেছে আমাদের ভিত্তি, আমাদের সকল শক্তি ও সিদ্ধির প্রথম আধার; আর প্রাণ-শক্তিকে ধরিয়াই জড়দেহে আমাদের জীবন সম্ভব হইয়াছে, জড়দেহে প্রাণই হইতেছে আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াসকলেরও ভিত্তি-স্বরূপ। নিত্য গতি-শীল জড়-উপাদান হইতে প্রকৃতি এমন দেহের গঠন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে যাহা একই সঙ্গে যথেষ্ট দৃঢ় ও স্থায়ী অথচ এমন নমনীয় ও পরিবর্ত্তনক্ষম যাহাতে উহা মানবের মধ্যে ভগবানের আত্ম-প্রকাশের উপযোগী মন্দির ও যন্ত্র হইতে পারিয়াছে। ঐতরেয়োপনিষদে একটি গল্পের দ্বারা এই তত্ত্বটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা দেবগণকে ক্ষুধাতৃষ্ণাযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিলে তাঁহারা বলিলেন "আমাদিগকে এমন কোন আশ্রয়স্থান দিন যেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমরা অন্ন ভক্ষণ করিতে পারি।" তাঁহাদের জন্য গো-দেহ আনিয়া দেওয়া হইল। তাঁহারা উত্তর করিলেন 'ন বৈ নোঽয়মলমিতি'—ইহা আমাদের জন্য উপোযোগী নহে। তখন তাঁহাদের জন্য অশ্ব-দেহ আনিয়া দেওয়া হইল। তাহাতেও দেবগণ সেই

একই উত্তর দিলেন। তখন সৃষ্টিকর্ত্তা মানব-দেহ আনিয়া দিলেন। সেই দেহ দেখিয়া দেবগণ বলিলেন—'সুকৃতং বতেতি। পুরুষো বাব সুকৃতম'। "ইহা সুন্দরভাবে নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। মানব-দেহ সত্যই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।" তখন দেবগণ মানবদেহে প্রবেশ করিতে সম্মত হইলেন। (ঐতরেয়োপনিষৎ ১।২।১-৩)।

জড় আর প্রাণ পরস্পরের বিরোধী—জড় তামসিক-ভাবাপন্ন, নিষ্ক্রিয়, প্রাণ সক্রিয়—প্রকৃতি এই দুইটি বিরোধী সত্তার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সাধন করিয়া জীবদেহের বিকাশ করিয়াছে। প্রাণ জড়ের মধ্যে বাস করে, জড়কে ভক্ষণ করিয়া নিজেকে পুষ্ট করে—ইহাতে যে কেবল প্রাণীজগতের অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে শুধু তাহাই নহে, মনেরও পূর্ণতম বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। জড় ও প্রাণের এই সামঞ্জস্যই হইতেছে মানুষের মধ্যে প্রকৃতির কর্ম্মের ভিত্তি, যোগের ভাষায় ইহাকে বলা হয় স্থূল শরীর, ইহা অন্নকোষ * এবং প্রাণকোষের দ্বারা গঠিত।

তাহা হইলে যে-সব উচ্চতর ক্রিয়া বিশ্ব-শক্তির লক্ষ্য, নিম্নতন এই দুইটি শক্তি জড় ও প্রাণের এই সামঞ্জস্যই

---

* যোগের ভাষায় জড়কেই অন্ন বলা হয়, কারণ জড়কে ভক্ষণ করিয়াই প্রাণ জীব-দেহে নিজের পুষ্টি সাধন করে।

যদি তাহাদের ভিত্তি ও প্রাথমিক উপায় হয়, এই আধারের মধ্যে যদি ভগবান নিজেকে প্রকট করিতে চান, 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্' এই ভারতীয় বাণীটি যদি সত্য হয় তাহা হইলে এই শরীরের জীবনকে শেষ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করার অর্থ হয় ভাগবত দৃষ্টির পূর্ণতা হইতে বিমুখ হওয়া, পৃথিবীতে ভগবানের উদ্দেশ্য-সিদ্ধিকেই প্রত্যাখ্যান করা। এইরূপ প্রত্যাখ্যান কোন কোন লোকের পক্ষে তাহাদের আত্ম-বিকাশের কোন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু ইহাকে কখনই মানবজাতির লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। অতএব যে যোগ-সাধনা শরীরটাকে অবজ্ঞা করে, অথবা পূর্ণ অধ্যাত্ম-সিদ্ধির জন্য শরীরের ধ্বংস বা প্রত্যাখ্যানকে অবশ্য-প্রয়োজনীয় মনে করে তাহা কখনই পূর্ণযোগ হইতে পারে না। পরন্তু শরীরটাকে সকল দোষত্রুটি হইতে মুক্ত করিয়া সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া তোলাই আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠ জয় বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। দৈহিক জীবনটাকেও দিব্যজীবনে পরিণত করিলে তবেই বিশ্বমাঝে ভগবানের কার্য্য পূর্ণ সার্থকতা ও সিদ্ধি লাভ করিবে। দেহটা আধ্যাত্মিকতায় বাধা দেয় বলিয়াই যে দেহটাকে বর্জ্জন করিতে হইবে ইহা কখনই সদ্‌যুক্তি হইতে পারে না; কারণ অদৃশ্য

ভাগবত বিধানে আমাদের বৃহত্তম বাধাগুলিই হইতেছে আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ। কোন পরমতম বাধা হইতেছে প্রকৃতির ইঙ্গিত, ঐটিকে জয় করিয়াই পরমতম জয় লব্ধ হইবে এবং একটি চরম সমস্যার সমাধান হইবে; একটা বিপজ্জনক ফাঁদ বলিয়া উহাকে এড়াইয়া চলা বা দুর্জ্জয় শত্রু বলিয়া উহার নিকট হইতে পলায়ন করা প্রকৃতির নির্দ্দেশ নহে।

আবার আমাদের মধ্যে প্রাণিক ও স্নায়বীয় শক্তি-সকলেরও ঐরূপই মহান উপযোগিতা রহিয়াছে, আমাদের চরম সংসিদ্ধিতে তাহাদেরও দিব্য পূর্ণতা সাধন চাই। বিশ্বপ্রপঞ্চে এই শক্তির মহান উপযোগিতা উপনিষদের উদার জ্ঞানে জোরের সহিতই ব্যক্ত করা হইয়াছে—

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঋচো যজূংষি সামানি যজ্ঞং ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ॥

প্রশ্নোপনিষৎ (২।৬)

"চক্রের নাভিতে যেমন শিক্‌গুলি বিধৃত থাকে তেমনি ত্রয়ী বিদ্যা, যজ্ঞ, শক্তিমানের বল, জ্ঞানীর পবিত্রতা, সবই প্রাণশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।"

'প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে
যৎ প্রতিষ্ঠিতম্'॥ প্রশ্ন (২।১৩

"ত্রিদিবে যাহা কিছু প্রতিষ্ঠিত আছে সে-সবই প্রাণের অধীন।"

প্রকৃতি তাহার ভিত্তি এবং প্রথম যন্ত্ররূপে আমাদের দৈহিক জীবনের বিকাশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং এখন তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী লক্ষ্য ও উচ্চতর যন্ত্ররূপে আমাদের মানসিক জীবনের বিকাশ করিতেছে। সাধারণতঃ এইটিই হইতেছে তাহার প্রধান কাজ; মাঝে মাঝে যখন সে পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করে কিছুদিনের জন্য যেন সকল অগ্রগতি বন্ধ থাকে, সেই সব সময় ছাড়া প্রকৃতি তাহার দৈহিক ও প্রাণিক বাধাসকল দূর করিতে পারিলেই সর্ব্বদা মনের বিকাশ লইয়াই ব্যস্ত থাকে। কারণ মানুষের এমন একটি বিশেষত্ব আছে যাহা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের মন একবিধ নয়, তাহা দ্বিবিধ ও ত্রিবিধ—(১) জড়াত্মক ও স্নায়বীয় মন (The mind material and nervous) (২) শুদ্ধ বুদ্ধিধর্ম্মী মন (The pure intellectual mind)—উহা নিজেকে দেহ ও ইন্দ্রিয়-সকলের ভ্রান্তি হইতে মুক্ত করে এবং (৩) দিব্য মন (divine mind)—ইহা বুদ্ধির উর্দ্ধে, ইহা যৌক্তিক বিচারশীল ও কল্পনাত্মক বুদ্ধি হইতে নিজেকে মুক্ত করে। মানুষের মধ্যে মন প্রথমে দৈহিক জীবনে জড়িত হইয়া থাকে;

উদ্ভিদের মধ্যে উহা সম্পূর্ণভাবেই আবদ্ধ ও আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, আর পশুর মধ্যে উহা সর্ব্বদাই বন্ধ অবস্থায় থাকে। এই জড়াত্মক স্নায়বীয় মন (material and nervous mind) এই দৈহিক জীবনকেই চরম বলিয়া গ্রহণ করে, ইহা যে মনের ক্রিয়ার একটা প্রাথমিক যন্ত্রমাত্র তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না, দেহের প্রয়োজন মিটাইতেই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে, যেন ইহা অপেক্ষা মহত্তর, উর্দ্ধতর লক্ষ্য আর কিছুই নাই। কিন্তু মানুষের দৈহিক জীবন হইতেছে কেবল ভিত্তি মাত্র, ঐটিই লক্ষ্য নহে, মানুষের পক্ষে ঐটি হইতেছে প্রাথমিক প্রয়োজন, পরন্তু ঐটিই তাহার চরম পরিণতি নহে। প্রাচীনেরা ঠিকই ধরিয়াছিলেন যে, মানুষ হইতেছে মূলতঃ মননশীল জীব, মনু, মনোময় সত্তা, সে প্রাণ ও দেহকে পরিচালিত করে, পশুর ন্যায় তাহাদের দ্বারা পরিচালিত হয় না, মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা (মুণ্ডকোপনিষদ ২।২।৮)। অতএব প্রকৃত মানবীয় জীবনের আরম্ভ কেবল তখনই হয় যখন জড়াত্মক মন হইতে বুদ্ধিধর্মী মন আবির্ভূত হয় এবং আমরা শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বশ্যতা হইতে মুক্ত মনের মধ্যে উত্তরোত্তর বাস করিতে আরম্ভ করি এবং সেই মুক্তির মাত্রা অনুসারে দৈহিক জীবনকে যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে পারি, যথা-

যথভাবে ব্যবহার করিতে পারি। কারণ স্বাধীনতার দ্বারাই নিম্নতর প্রকৃতিকে জয় করা যায়, কৌশলপূর্ণ বশ্যতার দ্বারা নহে। কারণ স্বাধীনভাবে দৈহিক জীবনকে গ্রহণ করা, অবশভাবে নহে—আমাদের দৈহিক সত্তাকে প্রসারিত ও উদ্দাত করা—ইহাই হইতেছে মানবতার সমুচ্চ আদর্শ।

মানুষের মধ্যে এই যে মানস জীবনের বিকাশ—ইহা বস্তুতঃ এখনও সাধারণের মধ্যে সুসিদ্ধ হয় নাই। বাহ্যতঃ দেখিলে মনে হয় যেন ইহার পূর্ণতম বিকাশ এখনও কতিপয় ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে; যেন বহু লোকের মধ্যে, এমন কি অধিকাংশের মধ্যেই, ইহা তাহাদের সাধারণ প্রকৃতির একটা ক্ষুদ্র ও অব্যবস্থিত অংশ অথবা ইহার বিকাশ একেবারেই হয় নাই অথবা ইহা নিষ্ক্রিয়ভাবে রহিয়াছে, সহজে কাজে লাগে না। ইহাতে কোন সন্দেহই নাই যে, প্রকৃতির ক্রমবিবর্ত্তনে মানস-জীবনের বিকাশ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই; মানবের মধ্যে এখনও ইহা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহার একটি লক্ষণ হইতেছে এই যে, জড় ও প্রাণশক্তির পূর্ণ ও সুন্দর সামঞ্জস্য, সুস্থ সবল দীর্ঘায়ু মানবদেহ সাধারণতঃ কেবল সেই সব শ্রেণী বা জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা মস্তিষ্ক চালনা

করিতে পরাঙ্মুখ, চিন্তাজনিত মানসিক বিক্ষোভ ও উত্তেজনাকে এড়াইয়া চলে অথবা যদি চিন্তা করিতে হয় ত জড়াত্মক মন দিয়াই স্থূলভাবে চিন্তা করে। সভ্য সংস্কৃতিশীল মানুষ এখনও পূর্ণভাবে সক্রিয় মন ও শরীরের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই; সাধারণতঃ ইহা তাহার দ্বারা লব্ধ হয় নাই। বস্তুতঃ দেখা যায় যে, মানসিক জীবনের উপর বেশী জোর দিলে অনেক সময়েই মানবীয় সত্তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়, এবং এই জন্যই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরাও বলিতে পারিয়াছেন যে, প্রতিভা হইতেছে একপ্রকার উন্মাদ রোগ, 'insanity', উহা স্বাস্থ্যহানির ফলস্বরূপ, উহা একটা প্রাকৃতিক ব্যাধি। যে-সব ব্যাপার দেখিয়া এইরূপ অত্যুক্তি করা সম্ভব হয় সেগুলিকে যদি স্বতন্ত্রভাবে না দেখিয়া সমগ্রের সহিত মিলাইয়া দেখা যায় তাহা হইলে অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। প্রতিভা হইতেছে আমাদের মানসিক শক্তিগুলিকে প্রবুদ্ধ ও গভীর করিবার জন্য বিশ্বশক্তির এমন একটি প্রয়াস যাহাতে তাহারা অতিবৌদ্ধিক (supra-intellectual) বা দিব্যমনের ঊর্দ্ধতর ক্রিয়া-সকলের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে। অতএব ইহা একটা প্রকৃতির খেয়াল নহে, কোন দুর্ব্বোধ্য

ঘটনা নহে, পরন্তু প্রকৃতির ক্রমবিবর্ত্তনের যথাযথ ধারায় এইটি হইতেছে একটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক প্রগতি। প্রকৃতি দৈহিক জীবনের সহিত জড়াত্মক মনের সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছে, এখন সে ইহার সহিত বুদ্ধিধর্ম্মী মনের ক্রিয়ার সামঞ্জস্য সাধনে ব্যাপৃত আছে; কারণ, যদিও উহা পশুসুলভ পূর্ণ প্রাণ-শক্তিকে কতকটা দমিত করে, তথাপি উহা বিশৃঙ্খলা বা বিক্ষোভ সৃষ্টি করে না এবং এরূপ বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবীও নহে। ইহা অপেক্ষা উর্দ্ধতর স্তরে উঠিবার জন্যও সে তীব্র প্রয়াস করিতেছে। আর এই প্রক্রিয়ায় যে-সব বিরোধ বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়, সে-সবকে যত বড় করিয়া দেখান হয়, বস্তুতঃ তাহারা তত বড় নহে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি হইতেছে নব নব বিকাশের স্থূল সূচনা, অন্যগুলি সহজেই সংশোধন করা যায়। অনেক সময়ে তাহারা নূতন কর্ম্মধারার সূত্রপাত করে, আর সকল সময়েই যে সুদূরপ্রসারী ফল-সকল প্রকৃতির লক্ষ্য, তাহাদের তুলনায় এইসব বিক্ষোভ বিশৃঙ্খলা নগণ্য।

আমরা যদি সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখি তাহা হইলে বোধ হয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব যে, মানসজীবন যে মানুষের মধ্যে এই নূতন আবির্ভূত হইতেছে তাহা নহে, প্রকৃতি পুরাকালে কখনও হয়ত

ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়া পুনরায় ইহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল, এখন আবার সেই সিদ্ধিরই দ্রুত পুনরাবৃত্তি করিতেছে ; প্রকৃতিতে কখনও কখনও এইরূপ শোচনীয় পশ্চাৎগমন ঘটিয়া থাকে। যাহাদিগকে আমরা বর্ব্বর জাতি বলি হয়ত তাহারা সভ্য মানবের পূর্ব্বপুরুষই নহে, পরন্তু তাহারা কোন পূর্ব্বতন সভ্যজাতিরই অবনতিগ্রস্ত বংশধর ! কারণ, এখন যদিও বুদ্ধির বিকাশ সর্ব্বত্র সমান দেখা যায় না, ঐ বিকাশের সামর্থ্য সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। বর্ব্বরতার অধিষ্ঠানভূমি মধ্য আফ্রিকার নিগ্রোগণকে বর্ব্বর জাতির দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করা হয়। কিন্তু দেখা গিয়াছে সেখানকার কোন কোন নিগ্রো উচ্চতাভিমানী ইয়ুরোপীয়নের ন্যায়ই বুদ্ধি বিকাশের সামর্থ্য দেখাইয়াছে, সেজন্য উচ্চতর জাতির সহিত রক্তমিশ্রণের প্রয়োজন হয় নাই। আর ব্যক্তিগত সামর্থ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও মনে হয় যে, বর্ব্বরজাতিগণ যদি সুযোগ-সুবিধা পায় তাহা হইলে তাহারা কয়েক পুরুষের মধ্যেই সভ্যজাতির সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারে, সেজন্য সহস্র সহস্র বৎসর অপেক্ষা করা প্রয়োজন হয় না। ইহা হইতে মনে হয় যে, মানুষ বা মনোময় সত্তারূপে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার পক্ষে আর ক্রমবিবর্ত্তনের ধীর মন্থরগতি অনুসরণ করা প্রয়োজন

হয় না অথবা ইতিপূর্ব্বেই তাহার মধ্যে বুদ্ধিধর্মী জীবনের উচ্চ সামর্থ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং সকল সময়েই অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা পাইলেই তাহা বিকশিত হইতে পারে। বর্ব্বরতার সৃষ্টি হয় মানসিক অক্ষমতার জন্য নহে পরন্তু দীর্ঘকাল সুযোগ ও উৎসাহের অভাবের জন্য। বর্ব্বরতা একটা মধ্যবর্ত্তী নিদ্রার মত, উহা আদিম অন্ধকার নহে।

তাহা ছাড়া যদি আধুনিক চিন্তাধারা ও আধুনিক কর্মধারার গতি লক্ষ্য করা যায় তাহা হইলেই বুঝা যায় যে, মানুষের মধ্যে প্রকৃতির প্রয়াস হইতেছে আধুনিক সভ্যতা মানসিক জীবনের বিকাশের জন্য যে সব সুযোগ সুবিধা আনিয়া দিয়াছে সেই সবকে সকলেরই অধিগম্য করিয়া সর্ব্বসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক শক্তির উৎকর্ষ সাধন করা। এমন কি আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র ইউরোপ যে জড়প্রকৃতি ও বাহ্য জীবনের দিকেই সমধিক দৃষ্টি দিয়াছে তাহাও প্রকৃতির ঐ প্রয়াসেরই অপরিহার্য্য অঙ্গ। উহা চায় মানুষের দৈহিক জীবন, প্রাণশক্তি ও বাহ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থায় এমন একটা পর্য্যাপ্ত ভিত্তি স্থাপন যাহার উপর মানুষের মানস শক্তিসকলের পূর্ণ-বিকাশ হইতে পারে। শিক্ষাবিস্তার, অনুন্নত জাতিদের

উন্নতিসাধন, পতিত শ্রেণীদের উদ্ধারসাধন, শ্রমলাঘব করিবার জন্য যন্ত্রপাতি, আদর্শ সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা আনয়নের প্রয়াস, উন্নত স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুস্থ সবল দেহের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়াস—এই সবই হইতেছে এই বিরাট প্রগতির সহজবোধ্য লক্ষণ। সকল সময়েই যে ঠিক ঠিক উপায় প্রযুক্ত হইতেছে তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের লক্ষ্য ঠিক আছে, এইটি যথাযথ প্রাথমিক লক্ষ্য —সুস্থ ও সবল ব্যক্তিগত ও সামাজিক শরীর এবং জড়াত্মক মনের বৈধ প্রয়োজন ও বাসনাসকলের তৃপ্তি, যথেষ্ট আরাম ও অবসর, সকলের পক্ষে সমান সুযোগ, যেন অতঃপর সমগ্র মানবজাতি—শুধু কোন বিশেষভাবে সমাদৃত জাতি বা শ্রেণী বা ব্যক্তি নহে—হৃদয়, মন ও বুদ্ধির পূর্ণবিকাশ অবাধে সম্পন্ন করিবার সকল রকম সুযোগ লাভ করে। বর্ত্তমানে দৈহিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যটিই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু সকল সময়েই মহত্তর লক্ষ্যটি ক্রিয়া করিতেছে বা যথাকালের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

যখন প্রাথমিক বিধানগুলি সম্পূর্ণ হইবে, এই মহৎ প্রয়াসের ভিত্তিটি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে তখন যে নূতন সম্ভাবনার বিকাশ হইবে—বুদ্ধি যাহার অনুগত হইবে—

তাহার স্বরূপ কি? মনই যদি হয় প্রকৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহা হইলে যুক্তি ও কল্পনাশক্তির পূর্ণবিকাশ এবং হৃদয়বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিসকলের সুসঙ্গত তৃপ্তি হইলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু, অন্যপক্ষে, মানুষ যদি যুক্তিশীল ও হৃদয়াবেগসম্পন্ন জীব অপেক্ষা মহত্তর কিছু হয়, এখন যাহা বিকশিত হইতেছে তাহা ছাড়া আরও কিছু যদি বিকশিত হইবার থাকে, তাহা হইলে ইহা খুবই সম্ভব যে, মানস জীবনের পূর্ণবিকাশ, বুদ্ধির সূক্ষ্মতা, নমনীয়তা এবং প্রসারিত শক্তি, হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির সুশৃঙ্খল সমৃদ্ধি—এ সবই হইবে এমন এক উচ্চতর জীবন ও অধিকতর শক্তিশালী বৃত্তিসকলের বিকাশের পূর্ব্বসূচনা মাত্র যাহা এখনও অভিব্যক্ত হয় নাই, যাহা অভিব্যক্ত হইয়া বুদ্ধিধর্ম্মী মনকে নিম্নতর যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিবে, ঠিক যেমন মন শরীরকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করায় মানব-শরীর আর শুধু নিজের তৃপ্তি লইয়াই থাকিতে পারে না পরন্তু এক উচ্চতর প্রক্রিয়ার ভিত্তি হইয়াছে এবং উপাদান যোগাইতেছে।

মানস জীবনের ঊর্দ্ধে একটা উচ্চতর জীবন আছে, এইটিই হইতেছে সকল ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের মূল কথা; সেই উচ্চতর জীবন লাভ করা, তাহাকে সুব্যবস্থিত করা

—ইহাই হইতেছে যোগসাধনার প্রকৃত লক্ষ্য। মন ক্রম-বিবর্ত্তনের চরম পরিণতি নহে, শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য নহে। উহা হইতেছে শরীরের ন্যায়ই একটি যন্ত্র, করণ। বস্তুতঃ যোগের ভাষায় মনকে অন্তঃকরণ বলিয়াই অভিহিত করা হইয়াছে। ভারতে একটি প্রবাদ আছে, এই যে-উচ্চতর জীবনের বিকাশ করিতে হইবে, মানবের অভিজ্ঞতায় ইহা একেবারে নূতন জিনিষ নহে, পুরাকালে ইহার বিকাশ হইয়াছিল, এমন কি কোন কোন যুগে উহা মানবসমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। যাহাই হউক, কখনও উহা নিশ্চয়ই আংশিক ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, নতুবা উহা অজানিতই থাকিত। আর যদি তাহার পরে প্রকৃতি আবার নীচে পড়িয়া গিয়া থাকে, তাহার কারণ নিশ্চয়ই এই যে কোনস্থানে সামঞ্জস্যটি সুসম্পন্ন হয় নাই, ভিত্তি-স্বরূপ দেহ ও বুদ্ধিতে কোথাও কোন ত্রুটি বিদ্যমান ছিল, নিম্নতর জীবনের হানি করিয়াই উচ্চতর জীবনের কোন বিশেষ দিকে অত্যধিক ঝোঁক দেওয়া হইয়াছিল,—প্রকৃতিকে এখন সেই ত্রুটি সংশোধন করিবার জন্য আবার নীচে নামিতে হইয়াছে।

কিন্তু এই যে উচ্চতর বা উচ্চতম জীবনের দিকে আমাদের বিবর্ত্তন অগ্রসর হইয়াছে, ইহা কি দিয়া গঠিত?

যোগশাস্ত্রে তিনপ্রকার শরীরের কথা বলা হইয়াছে—স্থূল শরীর, ইহা অন্নময় কোষ ও প্রাণময় কোষের দ্বারা গঠিত; সূক্ষ্ম শরীর, ইহা শুধু মনোময় কোষের দ্বারা গঠিত; ইহা ছাড়া আর একটি তৃতীয়, উচ্চতম দিব্য অতিমানস সত্তা আছে তাহাকে কারণশরীর বলা হয়, তাহা বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষের দ্বারা গঠিত। এই বিজ্ঞান মানসিক যুক্তি তর্কের দ্বারা লব্ধ জ্ঞান নহে, অথবা সম্ভাবনামূলক একটা মতবাদ মাত্র নহে—ইহা হইতেছে শুদ্ধ স্ব-প্রতিষ্ঠ, স্বয়ম্প্রকাশ সত্য। আর এই আনন্দ হৃদয় ও ইন্দ্রিয়ের অধিগম্য পরমতম সুখ নহে,—তাহার পিছনে সকল সময়েই থাকে দুঃখ ও বেদনা—পরন্তু এই আনন্দও হইতেছে স্ব-প্রতিষ্ঠ বিষয়-নিরপেক্ষ আত্মানন্দ—ইহা হইতেছে বিশ্বাতীত অনন্ত সত্তার আপন স্বরূপ, বলা যাইতে পারে যে এই আনন্দই হইতেছে সেই পরমতম সত্তার উপাদান, আনন্দং ব্রহ্মণো···।

অন্তর্জীবন সম্বন্ধে এই ধারণা, এ-সব কি বাস্তব? কার্য্যতঃ সিদ্ধ করা সম্ভব? সকল যোগসাধনাই ইহাকে চরম অনুভূতি ও পরমতম লক্ষ্য বলিয়াছে। আমাদের চৈতন্যের যাহা উচ্চতম সম্ভাবনা, আমাদের জীবনের বৃহত্তম প্রসার, ঐ গুলিই হইতেছে তাহার মূল সূত্র। আমাদের

মানসিক ক্রিয়ায় তিনটি বৃত্তি আছে—অনুপ্রেরণা (inspiration), সংবোধি (intuition), প্রকাশন (revelation); ঊর্দ্ধতর স্তরে এই তিনটি শ্রেষ্ঠ বৃত্তির একটা সমন্বয় হইয়াছে, দিব্যমনেরও ঊর্দ্ধে একটা উচ্চতর স্তরে তাহাদের ক্রিয়া হইতেছে সত্যকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করা, অথবা বলা যাইতে পারে যে সে ক্রিয়া হইতেছে সত্যেরই আত্মপ্রকাশ। এই সকল উচ্চতম বৃত্তি হইতেছে এমন এক চৈতন্যময় সত্তার জ্যোতি যাহা অহংভাবাত্মক সত্তার ঊর্দ্ধে অবস্থিত, তাহা একই সঙ্গে বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত, তাহার স্বরূপই হইতেছে আনন্দ। বলা বাহুল্য যে এই-সবই হইতেছে ভাগবত চৈতন্যের ক্রিয়া, আর এখন মানুষ যে স্তরে রহিয়াছে তাহাতে এইসবই হইতেছে অতি-মানব স্তর। বস্তুতঃ পরমাত্মাকে দর্শনশাস্ত্র সচ্চিদানন্দ বলিয়াই বর্ণনা করে, তাহা একাধারে সৎ বা বিশ্বাতীত স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা, চিৎ বা স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মচৈতন্য এবং স্ব-প্রতিষ্ঠ আত্মানন্দ; অজ্ঞেয় পরম সত্তা আমাদের জাগ্রত চৈতন্যে এই সচ্চিদানন্দ রূপেই প্রকট হন—তাঁহাকে আমরা সচ্চিদানন্দ বিশ্বপুরুষ বলিয়া ধারণা করি অথবা শুদ্ধ নির্ব্যক্তিক সৎ, চিৎ, আনন্দকে অন্তর্জীবনের এক একটি দিক বলিয়াও দেখা হয়—আমাদের বাহ্য চৈতন্য এখনও

এ-সব সম্বন্ধে জাগ্রত হয় নাই, উহারা আমাদের মধ্যে অতিচেতন স্তরে রহিয়াছে, অতএব যে-কোন সময়ে আমরা তাহাদের মধ্যে উঠিতে পারি।

কারণশরীর হইতেছে আর দুইটি করণশরীর হইতে ভিন্ন—উহাদের নামকরণ হইতেই তাহা নির্দেশিত হয়। বিবর্ত্তনের চরম লক্ষ্য এই যে কারণশরীর, ইহা আবার হইতেছে অন্য যাহা কিছু ইতিপূর্ব্বে বিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাদের উৎস ও কার্য্যকরী শক্তি। বস্তুতঃ আমাদের মানসিক ক্রিয়াসকল হইতেছে ভাগবত জ্ঞান হইতে উদ্ভূত, আর যতক্ষণ তাহারা তাহাদের নিগূঢ় উৎস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে ততক্ষণ তাহারা হইতেছে সেই জ্ঞানের বিকৃত রূপ। ভাগবত আনন্দের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও হৃদয়বৃত্তি-সকলেরও সেই সম্বন্ধ, ভাগবত ইচ্ছাশক্তির সহিত আমাদের স্নায়বীয় শক্তি ও ক্রিয়াসকলেরও সেই সম্বন্ধ, ভাগবত আনন্দ ও চৈতন্যের শুদ্ধ স্বরূপের সহিত আমাদের স্থূল ভৌতিক সত্তারও (physical being) সেই একই সম্বন্ধ। আমরা যে বিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছি, মানুষ যাহার শ্রেষ্ঠ পার্থিব পরিণতি, সেটিকে একটা উল্টা অভিব্যক্তিরূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে—ভাগবত জ্ঞান, চৈতন্য, ইচ্ছাশক্তি, আনন্দ তাহাদের একত্বে ও

বৈচিত্র্যে কার্য্য করিয়া জড়, প্রাণ ও মনের ত্রুটিপূর্ণ সত্তা ও ক্রিয়াসকলকে বিকশিত, ত্রুটিশূন্য ও পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে যেন তাহারা যে ভাগবত ও শাশ্বত শক্তিসকল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়া তাহাদিগকে উত্তরোত্তর সুসঙ্গতভাবে প্রকট করিতে পারে। এইটিই যদি বিশ্বের প্রকৃত সত্য ও অর্থ হয়, তাহা হইলে বিবর্ত্তনের যেটি লক্ষ্য সেইটিই আবার হইতেছে উহার কারণ, যাহা পূর্ব্ব হইতেই নিম্নতন সত্তার মধ্যে অনুস্যূত ছিল তাহাই সেখানে প্রকট হইতেছে। কিন্তু এই মুক্তি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে যদি উহার অর্থ হয় নিম্নতর সত্তাকে ছাড়িয়া যাওয়া, পুনরায় সেই সত্তা ও তাহার ক্রিয়াসকলকে গ্রহণ করিয়া তাহাদের উন্নতি ও রূপান্তর সাধন না করা। এইরূপ রূপান্তর সাধনই যদি লক্ষ্য ও পরিণতি না হইবে তাহা হইলে ঐ অনুস্যূতিরই বা প্রয়োজন কি ছিল ? কিন্তু যদি মানব-মন দিব্যজ্যোতির সম্পদসকল বিকাশ করিতে সমর্থ হয়, মানবীয় হৃদয়বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে পরম আনন্দের উপাদান ও ছন্দে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়, মানবীয় কর্ম্ম দিব্য ও অহংভাবশূন্য কর্ম্মে পরিণত হইতে পারে, আর এই স্থূল ভৌতিক দেহ দিব্য রূপান্তর লাভ করিয়া নমনীয়তা ও

স্থায়িত্ববিধায়ক দৃঢ়তার এমন সামঞ্জস্য করিতে পারে যাহাতে উহা উল্লিখিত উচ্চতম অনুভূতি ও ক্রিয়াসকলের সুচিরস্থায়ী আধার হইতে পারে—তাহা হইলেই প্রকৃতির দীর্ঘ প্রয়াস চরম সার্থকতায় পর্যাবসিত হইবে এবং তাহার ক্রমবিবর্ত্তনের গভীর রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে।

এই পরমতম দিব্যজীবনের একটু ইঙ্গিতও এমন চমৎকারক, ইহার আকর্ষণ এমনই চিত্তহারী যে একবার ইহার আভাস পাইলে ইহার সাধনায় আর সব কিছুই অবহেলা করিতে পারা যায়। যেমন একদিকের অতিবাদ হইতেছে মনের সকল সম্পদকে এবং মানসিক জীবনকেই একমাত্র চরম আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা, তেমনই ইহার বিপরীত দিকের অতিবাদ হইতেছে মনকে অসার বিকৃতি ও পরম বাধা বলিয়াই দেখা; এই মত অনুসারে মন হইতেছে এই মিথ্যাময় জগতের উৎপত্তিস্থল, সত্যের অপলাপসাধক, আমরা যদি চরম মুক্তি চাই তাহা হইলে মনের এবং মনের সকল ক্রিয়া ও পরিণতির অপলাপ সাধন করিতে হইবে। ইহা হইতেছে অর্দ্ধসত্য, ইহার ভুল হইতেছে এই যে, ইহা মনের ত্রুটি ও অপূর্ণতাসকলকেই দেখে, ইহার যে দিব্য সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা দেখিতে চাহে না। চরম জ্ঞান হইতেছে তাহাই যাহা ভগবানকে যেমন বিশ্বের উর্দ্ধে

তেমনই বিশ্বের মধ্যে দেখে ও বরণ করিয়া লয়; আর পূর্ণযোগ হইতেছে তাহাই যাহা বিশ্বাতীতকে লাভ করিয়া আবার বিশ্বের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারে, সৃষ্টির সরণী বাহিয়া ইচ্ছামত উঠিতে ও নামিতে পারে। কারণ শাশ্বত প্রজ্ঞা বলিয়া যদি কিছু আদৌ থাকে, তাহা হইলে মনেরও কোনও সমুচ্চ উপযোগিতা ও সার্থকতা আছেই। সেই উপযোগিতা হইতেছে চেতনার ঊর্দ্ধগতিতে সহায় হওয়া, সেই সার্থকতা হইতেছে সংসিদ্ধি ও রূপান্তর লাভ, নির্ম্মূল বা ধ্বংস হওয়া নহে।

তাহা হইলে প্রকৃতিতে আমরা তিনটি স্তর দেখিতেছি —(১) দৈহিক জীবন, ইহা হইতেছে জড়জগতে আমাদের জীবনের ভিত্তিস্বরূপ; (২) মানসজীবন, আমরা ইহার মধ্যে বিবর্ত্তিত হই এবং ইহার দ্বারা দৈহিক জীবনকে উন্নত করিয়া উচ্চতর কার্য্যে লাগাই; এবং (৩) দিব্যজীবন, ইহা হইতেছে পূর্ব্ব দুইটির লক্ষ্য, আবার উহা সেই দুটিকে গ্রহণ করিয়া তাহাদেরই উচ্চতম সম্ভাবনা বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এই তিনটির কোনটিকেই আমরা আমাদের সাধ্যাতীত বলিয়া অথবা আমাদের প্রকৃতির অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি না, চরম সিদ্ধিলাভের জন্য কোনটিরই ধ্বংস অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করি

না, এইরূপ মুক্তি ও সংসিদ্ধিকেই আমরা যোগের লক্ষ্যের অংশ বলিয়া, বৃহৎ ও প্রয়োজনীয় অংশ বলিয়াই স্বীকার করি।*

* শ্রীঅরবিন্দের The Synthesis of Yoga অবলম্বনে লিখিত।

ভারতের বাণী ও শ্রীঅরবিন্দ

"আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন সেই অপেক্ষায় থাকবো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে, শৃন্বন্তু বিশ্বে"। —রবীন্দ্রনাথ

১৯২২ সালে যখন শ্রীঅরবিন্দকে আহ্বান করা হয় তাঁহার নির্জ্জনবাস হইতে বাহির হইয়া ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে তখন তিনি স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে লিখিত একখানি পত্রে এই উত্তর দিয়াছিলেন—

"আমার বর্ত্তমান আদর্শ কি এবং তদনুযায়ী জীবন ও কর্ম্মের প্রতি আমার কি মনোভাব সম্ভবতঃ আপনি তাহা অবগত আছেন। একটি ধারণা আমার বদ্ধমূল হইয়াছে —এ ধারণাটি সকল সময়েই ছিল কিন্তু প্রথম প্রথম উহা তেমন পরিষ্কার ও শক্তিশালী ছিল না, এখন তাহা উত্তরোত্তর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—সে ধারণা এই যে, জীবন ও কর্ম্মের সত্য ভিত্তি হইতেছে আধ্যাত্মিক, অর্থাৎ এমন এক নূতন চৈতন্য যাহা কেবল যোগসাধনার দ্বারাই

বিকশিত হইতে পারে। উত্তরোত্তর স্পষ্টভাবেই আমি দেখিতেছি যে, মানবজাতি যে বৃথা চক্রে অনবরত ঘুরপাক খাইতেছে ইহা হইতে সে কিছুতেই মুক্ত হইতে পারিবে না। যতক্ষণ না মানুষ নিজেকে সেই নূতন ভিত্তিতে উত্তোলিত করিতেছে। আর আমি ইহাও বিশ্বাস করি যে, জগতের জন্য এই মহান বিজয় অর্জ্জন করাই হইতেছে ভারতের মহাব্রত। কিন্তু এই যে মহত্তর চৈতন্যের কথা বলিলাম, ইহার কার্য্যকরী শক্তির ঠিক স্বরূপটি কি? কি সর্ত্তে উহাকে বাস্তব সত্যে পরিণত করা যাইতে পারে? কেমন করিয়া উহাকে নামাইয়া আনা যাইবে, গতিশীল করা যাইবে, সুব্যবস্থিত করা যাইবে, জীবনের উপর প্রয়োগ করা যাইবে? কেমন করিয়া আমাদের বর্ত্তমান যন্ত্রগুলিকে, আমাদের বুদ্ধি, মন, প্রাণ দেহকে এই মহান রূপান্তরের সত্য ও সুসিদ্ধ আধারে পরিণত করা যাইবে? এই সমস্যাটিই আমি এত দিন আমার নিজ অনুভূতির ভিতর দিয়া সমাধান করিবার প্রয়াস করিয়াছি, এবং এখন একটা নিশ্চিত ভিত্তি এবং প্রশস্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছি, এই নিগূঢ় রহস্যটিকে অনেকখানি আয়ত্ত করিয়াছি। তবে এখনও পূর্ণভাবে ও অব্যর্থ শক্তিতে ইহা লাভ করিতে পারি নাই,—অতএব এখনও আমাকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে

সরিয়া থাকিতে হইতেছে। কারণ আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, এই নূতন কর্ম্মশক্তি যতদিন না আমি নিশ্চিত ও পূর্ণভাবে লাভ করিতেছি ততদিন বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব না—ভিত্তিকে নিখুঁত ও সুসিদ্ধ না করিয়া আমি গঠনকার্য্য আরম্ভ করিব না।"

এই চিঠিখানি লেখা হইয়াছিল ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে, তাহার পর হইতে ঐ "নূতন কর্ম্মশক্তি"র উপর তাঁহার প্রভুত্ব ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং তিনি তাঁহার জীবন-ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য ইতিমধ্যেই কতকগুলি প্রাথমিক কার্য্যের সূচনা করিয়াছেন। কিন্তু যদিও তাঁহার পণ্ডিচেরী আশ্রমে ইতিমধ্যেই সাধনা ও সংস্কৃতির একটি মহৎ কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানেও তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া নানা কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, তথাপি শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম কর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম ও বিরাট সম্ভাবনা আজ পর্য্যন্ত অতি অল্প লোকেরই বোধগম্য হইয়াছে। সে কর্ম্মের লক্ষ্য হইতেছে সমগ্র জীবনকে গ্রহণ করা, সকল ক্রিয়াকে অধ্যাত্মভাবাপন্ন করা, পরন্তু কোন ক্রিয়াকে বর্জ্জন করা নহে। শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করেন, ভারত স্বাধীন হইয়া তাহার মহান অধ্যাত্ম আদর্শকে নূতন ও উদারতর ধারায় অনুসরণ করিবে—এবং

এইরূপ ভারতই জগৎকে উদ্ধার করিবে, পার্থিব ক্রম-বিকাশে এক গৌরবময় নবযুগের সূচনা করিবে—শ্রীঅরবিন্দের সকল প্রয়াস এই লক্ষ্যের দিকেই পরিচালিত।

কিন্তু এই অধ্যাত্ম আদর্শটি কি? যে অধ্যাত্ম শক্তিকে শ্রীঅরবিন্দ একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করেন, যাহার ভিত্তির উপরেই মহত্তর স্বাধীন ভারত গড়িয়া উঠিবে—সেই শক্তিটির প্রকৃত স্বরূপ কি? বর্ত্তমান ভারতে মহাত্মা গান্ধী Soul-force বা আত্মশক্তির আদর্শ প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার মতে সকল সত্য কর্ম্মের পশ্চাতে থাকিবে এই আত্ম-শক্তি, এবং লোকে সাধারণতঃ ইহাকেই আধ্যাত্মিকতা বলিয়া মনে করে। কিন্তু এই যে শক্তির কথা গান্ধীজী বলিতেছেন, ইহা প্রকৃত অধ্যাত্ম শক্তি নহে, ইহা হইতেছে নৈতিক-সংযম অভ্যাসের উপর প্রতিষ্ঠিত মানসিক ইচ্ছাশক্তি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ আধ্যাত্মিকতা বলিতে বুঝেন একটা নূতন চৈতন্য, তাহা মন ও নৈতিকতার ঊর্দ্ধে, বুদ্ধেঃ পরতস্তু, যোগসাধনা ভিন্ন সে চৈতন্য লাভ করা যায় না। মানসিক ও নৈতিক সংযমই আধ্যাত্মিকতা নহে, যদিও ঠিক পথে পরিচালিত হইলে উহা প্রকৃতিকে আধ্যাত্মিকতার জন্য প্রস্তুত হইতে সাহায্য

করিতে পারে। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও হইতেছে ঐ কথা, উহাও মনের জিনিষ, প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা নহে। আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝা যে লোকের পক্ষে কঠিন হইতেছে তাহার কারণ ভারতে বর্ত্তমানে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি, উহা ভারতীয় মস্তিষ্কের মধ্যে পাশ্চাত্য মনোভাব সৃষ্টি করিয়া দেয়। পাশ্চাত্য মনোভাব জড়বিজ্ঞানের দ্বারা গঠিত ; জড়বিজ্ঞান বস্তু-সকলের মূল সতা দেখিতে পারে না, কেবল বাহ্য কর্ম্মধারাটি দেখে, বাহিরের দিকেই উহার দৃষ্টি। তাই আমরা দেখিতে পাই পাশ্চাত্যজাতি বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা, সামাজিক ও রাজনৈতিক উপায়ের দ্বারা পৃথিবীতে নবতন্ত্র স্থাপনের প্রয়াস করিতেছে। এইরূপ মনোভাব আধ্যাত্মিকতাকে একেবারেই বর্জ্জন করে, আর যদিই বা গ্রহণ করে উহাকে ধর্ম্ম ও নৈতিকতায় পরিণত করে। ধর্ম্ম হইতেছে কতকগুলি বাহ্য প্রক্রিয়ার বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান, আর নৈতিকতা হইতেছে আচার ব্যবহারে কতকগুলি নিয়ম পালন। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা বিধিনিষেধ নিয়ম-কানুনের জিনিষ নহে, উহা হইতেছে অন্তরতম আত্মা হইতে স্বতঃ উৎসারিত জীবনধারা।

ভারতীয়গণের পক্ষে এখন যান্ত্রিক মনোভাব হইতে মুক্ত হইবার সময় আসিয়াছে—অন্ধ জড়বাদ পরিত্যাগ

করিবারও সময় আসিয়াছে। এমন কি বিজ্ঞানই যে জড়বাদ হইতে মুক্ত হইতেছে তাহার সুস্পষ্ট লক্ষণসকল দেখা যাইতেছে—একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, "জড়জগৎ সম্বন্ধে আমরা এখন এমন সব তথ্য জানিয়াছি যাহাতে আর জড়বাদকে ধরিয়া থাকা চলে না।" তাহা ছাড়া জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য সভ্যতা যে আত্মঘাতী বিপ্লব ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ফলেও লোকের মন জড়বাদ হইতে বিমুখ হইয়া আধ্যাত্মিকতার দিকেই বিশেষভাবে ঝুঁকিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর একজন বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন—"আজ আমরা জড়বাদের কবল হইতে অতি কষ্টে মুক্তিলাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। জড়বাদী যুগের দান সামান্য নহে, বিজ্ঞান উহার প্রেরণায় যে-সকল অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার করিয়াছে মানবজীবনের পক্ষে সেগুলি খুবই উপযোগী—কিন্তু সেই সঙ্গে উহা আধ্যাত্মিকতাকে অবহেলা করিয়াছে, এবং সম্ভবতঃ তাহাই হইতেছে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের মূল কারণ।" কিন্তু ভারতের লোক, বিশেষতঃ ভারতের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ এখনও পাশ্চাত্য জড়বাদের মোহ ছাড়াইতে পারিতেছে না এবং নিজ দেশের বিশিষ্ট প্রতিভাকে অবহেলা করিয়া পাশ্চাত্য

আদর্শ, পাশ্চাত্য মতবাদের অন্ধ অনুসরণে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। ইউরোপে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে যে-সব যুক্তি প্রয়োগ করা হইত, ভারতের আধুনিক বিজ্ঞগণ সেই সব যুক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে জনৈক অধ্যাপক মত প্রকাশ করিয়াছেন, "মানুষের মধ্যে পূজা করার যে প্রবৃত্তি দেখা যায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসর বয়সে শিশুর সহিত তাহার পিতামাতার যে সম্বন্ধ সম্ভবতঃ তাহা হইতেই ঐ ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উদ্ভব হয়। যদি ঐ প্রবৃত্তিকে উন্মূল করা প্রয়োজন হয়, সম্ভবতঃ যথোচিত শিক্ষা দ্বারা তাহা করা যাইতে পারে।" এইটুকু কথার মধ্যে দুইবার "সম্ভবতঃ"! অর্থাৎ এই সকল শিক্ষিত শ্রেণীর লোকের কোন জিনিষেই ভাল বিশ্বাস নাই, আত্ম-বিশ্বাস নাই, সত্যকে তাহারা দৃঢ়-ভাবে ধরিতে পারেন না, মিথ্যাকে সবলে বর্জ্জন করিতে পারেন না। মানুষের মধ্যে যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তাহা নির্ম্মূল করা কি এতই সহজ! রুশিয়া গত ২৫ বৎসর ধরিয়া সে চেষ্টার কোন কসুর করে নাই—কিন্তু এখন সে আশা ছাড়িয়া দিয়াছে। আমাদিগকে কি রুশিয়ার ঐ ব্যর্থ প্রয়াসের অনুকরণ করিয়া সময় ও শক্তির অপব্যয় করিতে হইবে? আমাদের জাতীয় প্রতিভার অনুযায়ী অন্য

পন্থাটিই অনুসরণ করা যাউক না কেন? দেখা যাউক মানুষের এই অদম্য ধর্ম্মপ্রবৃত্তির মূলে কি নিগূঢ় সত্য রহিয়াছে। সেই সত্যের সন্ধান না করিয়া মানবজীবনকে উচ্চতর স্তরে তুলিবার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইতে বাধ্য। মানুষকে বুঝিতে হইবে, তাহার প্রকৃতির মূল স্বরূপ কি তাহা সন্ধান করিতে হইবে, তবেই আমরা মানবসমাজের কঠিন সমস্যা সকলের সমাধান করিতে পারিব।

ধর্ম্ম প্রেরণা মানুষের মজ্জাগত, ইহাকে তর্কের দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া চলে না। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষের এই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অনেক স্থলেই তাহার বিপদের কারণ হয় এবং হইয়াছে। অজ্ঞান লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে স্বার্থপর লোক নিজেদের কাজে লাগায়, ধর্ম্মের নামে লোককে যত ঠকান হয়, এমনটি বোধ হয় আর কিছুতেই হয় না। ইহা হইতে ধর্ম্মের অসত্যতা প্রমাণিত হয় না, বরং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দৃঢ়-মূলতাই প্রতিপন্ন হয়, প্রমাণিত হয় যে, মানবপ্রকৃতিতে ধর্ম্মের মূল গভীর ও অচ্ছেদ্য। তবে মানুষ এখনও যে অজ্ঞানের মধ্যে রহিয়াছে তাহাতে এই প্রেরণা অন্ধ প্রেরণার মত কাজ করে, হৃদয়ের গভীর অভীপ্সাকে তৃপ্ত করিবার জন্য কাহার কাছে যাইতে হইবে, কোন্ পথ

ধরিতে হইবে মানুষ ঠিক করিতে পারে না, তাই অসৎ বা স্বার্থপর লোকের দ্বারা তাহারা পদে পদে প্রতারিত হয়। ইহার প্রতিকার, মানবপ্রকৃতি হইতে ধর্মপ্রবৃত্তিকে নির্মূল করিবার বৃথা প্রয়াস নহে, পরন্তু মানুষকে তাহার এই মজ্জাগত প্রেরণার স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া এবং তাহাকে ঠিক পথে পরিচালিত করা। শ্রীঅরবিন্দ এই কথাই The Life Divine গ্রন্থের প্রথমে বলিয়াছেন, "The attempt to deny or stifle a truth because it is yet obscure in its outward workings and too often represented by obscurantist superstition or a crude faith, is itself a kind of obscurantism,...It is better and more rational to accept what she (Nature—the great Mother) will not allow us as a race to reject and lift it from the sphere of blind instinct, obscure intuition and random aspiration into the light of reason and an instructed and consciously self-guiding will."

Vol 1, pp.6, 7.

মানুষের অন্ধ ধর্ম্ম-প্রেরণাকে যুক্তির আলোকে যাচাই করিতে হইবে, যেন সে সজ্ঞানে উহার অনুসরণ করিতে পারে, অন্ধকারে পথ-ভ্রান্ত না হয়। সমগ্র Life Divine গ্রন্থটি হইতেছে এই আলোর পরম উৎস—ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে মানুষের মনে যত প্রশ্ন, যত সংশয় উঠিতে পারে, অপূর্ব্ব যুক্তি সহকারে সে-সবের গভীর সমাধান করা হইয়াছে। যাহারা তাহা অনুধাবন না করিয়া অবহেলায় আধ্যাত্মিকতার বিরোধিতা করিবে তাহারা ইহাই প্রমাণিত করিবে যে তাহারা সত্যকে চায় না, নিজেদের মনগড়া বা অপরের নিকট হইতে ধার করা কোন একটা সঙ্কীর্ণ মতবাদকেই ধরিয়া থাকিয়া যথাসম্ভব আত্ম-তৃপ্তি লাভ করিতে চায়।

যুগে যুগে দেশে দেশে ধর্ম্মপ্রেরণার যে অভিব্যক্তি তাহা হইতে বুঝা যায় যে মানুষের অন্তরাত্মা ভগবানকে চায়, খাঁটি সত্য চায়, অবিমিশ্র আনন্দ চায়, জ্যোতি চায়, মুক্তি চায়, এই মর্ত্ত্যদেহেই অমৃতত্ব লাভ করিতে চায়, বেদের ভাষায়, মর্ত্ত্যেষু অমৃত। এই অমৃতত্ব লাভের পথে মানুষের যে অভিযান যুগযুগান্তর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে যতক্ষণ না তাহা তাহার চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতেছে ততক্ষণ কোথাও সে স্থির হইয়া বিশ্রাম করিতে পারিবে

না, কোনকিছু লাভ করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারিবে না। বর্ত্তমানে চারিদিকে যে ধর্ম্মভাবের নবজাগরণ দেখা যাইতেছে, আঘাতের পর আঘাত খাইয়া মানুষ যে-ভাবে আবার আধ্যাত্মিকতার দিকে ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা হইতে মনে হয় মানবজাতির এক মহান অধ্যাত্ম সিদ্ধিলাভের সময় আসিয়াছে। কি করিলে তাহা সফল হইবে, তাহার পথে বাধাবিঘ্ন কি, সে সব এখন স্পষ্টভাবে দেখিতে হইবে, বুঝিতে হইবে—নিজ নাভিগন্ধে মত্ত কস্তুরী মৃগের ন্যায় পাগল হইয়া ইতস্ততঃ বনে ঘুরিয়া বেড়ান নহে, এখন সুনির্দ্দিষ্ট আলোকে সমুজ্জ্বল পথে নিশ্চিত পদবিক্ষেপে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, এবং সেজন্য চাই উত্তম দিশারী ও সত্যপূর্ণ নিঃসংশয় শাস্ত্র।

অনেকেই আজকাল বলিতেছেন যে, একমাত্র ধর্ম্মের দ্বারাই বর্ত্তমান সঙ্কট হইতে মানবজাতি উদ্ধার পাইতে পারে। কিন্তু পৃথিবীতে ধর্ম্ম কিছু নূতন জিনিষ নহে, এতদিন ধর্ম্ম যখন মানবসমাজকে চির দ্বন্দ্ব ও অশান্তি হইতে উত্তোলিত করিতে পারে নাই, এমনকি নিজেই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছে তখন ধর্ম্ম যে অতঃপর প্রকৃত পথ দেখাইতে পারিবে তাহার ভরসা কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে দেখিতে হইবে ধর্ম্ম বলিতে সাধারণতঃ কি বুঝায় এবং তাহা মানুষকে

ভগবানের পথে বেশী দূর অগ্রসর করাইয়া দিতে এত দিন পারে নাই কেন। শ্রীঅরবিন্দ এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন তাহা সংক্ষেপতঃ এই যে, মানুষ এখন যে নিম্নতর প্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে ইহার স্বরূপই হইতেছে অজ্ঞান ও দ্বন্দ্ব, ইহার মধ্যে থাকিয়া মানুষ কখনই উচ্চতর শান্তিময়, জ্যোতির্ম্ময়, আনন্দময় জীবন বা অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবে না। এই প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া উঠিতে হইলে ইহার সহিত কোনরূপ রফা করা চলিবে না, ইহার স্বরূপগত ক্রিয়াসকলকে অকুণ্ঠভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে —এবং সেই সকল ক্রিয়ার মূল হইতেছে অহংভাব এবং অহংমূলক বাসনা কামনা। অতএব এই সবকেই বর্জ্জন করিতে হইবে। ধর্ম্ম ইহা করিতে পারে নাই, যাহারা ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যাহারা সাংসারিক জীবন যাপন করিতে চায় তাহাদিগকে নিম্নপ্রকৃতির সহিত একটা রফা করিতে হইয়াছে এবং ধর্ম্ম তাহাতেই সায় দিয়াছে। সংযতভাবে বাসনা কামনার তৃপ্তি কর, অহংয়ের সেবা কর, অহংয়ের সহিত যাহাদের নিবিড় সম্বন্ধ সেই সকল আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিবৃত থাকিয়া "সংসারধর্ম্ম" পালন কর—সেই সঙ্গে ভগবানেরও পূজা কর, প্রার্থনা কর, দান

ধ্যান কর, তীর্থে যাও—তাহা হইলেই ধর্ম্মজীবন যাপন করা হইবে। বিভিন্ন ধর্ম্মের পূজার পদ্ধতি, উপাসনার পদ্ধতি ভিন্ন হইতে পারে, দেশকালভেদে স্বভাবতঃ এই সবে পার্থক্য হইয়াছে, কিন্তু মূলতঃ সকল ধর্ম্মই উল্লিখিত ভাবে নিম্নপ্রকৃতির সহিত রফা করিতে বাধ্য হইয়াছে—নতুবা সকলেই অহংত্যাগী, বাসনাত্যাগী সন্ন্যাসী হইলে সংসার যে অচল হয়!

কিন্তু সংসার চলিতেছেই বা কোথায়? ঘানিগাছে চোখবাঁধা বলদের মত ঘুরিলেই কি তাহাকে চলা বলে? বাসনার রজ্জুতে বাঁধা মানুষ অহংয়ের চারিদিকে অনবরত ঘুরিতেছে—এবং বার বার জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে। লক্ষের মধ্যে দুই একজন হয়ত রজ্জু কাটিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে—কিন্তু মানবজাতি যে তিমিরে সেই তিমিরে। গীতা এই সমস্যার যে সমাধান দিয়াছে তাহাই যে চূড়ান্ত সমাধান সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই—সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়া নহে, সন্ন্যাসী হইয়াই সংসারে থাকা, অর্থাৎ অহংভাবকে নির্ম্মূল করিয়া, বাসনা কামনাকে নিঃশেষ করিয়া, হৃদিস্থিত ভগবানের সহিত সজ্ঞানে যুক্ত হইয়া সংসারেই থাক, সংসারের প্রয়োজনীয় সকল কর্ম্ম কর, সর্ব্বকর্ম্মাণি। শ্রীরামকৃষ্ণও বর্ত্তমান যুগে

এই আদর্শ প্রচার করিয়াছেন—"পাঁকাল মাছের মত থাক। সে পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁক নাই। ঈশ্বরের উপর মন ফেলে রেখে সংসারের কাজ সব কর।"

আমরা দেখি গীতার ও শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শটি পাশ্চাত্য জাতিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিতেছে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্র আমেরিকাতেই যে ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, সেখানকার আধুনিক সাহিত্য হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। একজন বিখ্যাত আধুনিক ঔপন্যাসিক, Maugham, সম্প্রতি একটি উপন্যাস প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার নাম The Razor's Edge—উপনিষদেরই কথা, ক্ষুরস্য ধারা। গল্পটি সংক্ষেপতঃ এই—গল্পের নায়ক গত যুদ্ধের (World War I) পর জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য অস্থির হইয়া চিকাগো হইতে চীন নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া শেষে দক্ষিণ ভারতের এক আশ্রমে দুই বৎসর বাস করে এবং সেখানে অধ্যাত্ম অনুভূতির ভিতর দিয়া জীবন সমস্যার একটা সমাধান পায়। তাহার পর প্যারিস হইয়া সে আমেরিকায় ফিরিয়া যায় এবং সেখানে জীবন ও কর্ম্ম-স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। আবার সংসারে ফেরা সম্বন্ধে সে নিজেই এই কৈফিয়ৎ দিয়াছে—"It was not for me

to leave the world and retire to a cloister but to live in the world and love the objects of the world, not indeed for themselves, but for the Infinite that is in them." —"To live with calmness, forbearance, compassion, selflessness and confidence." ইহা সেই গীতা ও রামকৃষ্ণেরই কথা, পাঁকাল মাছের মত থাক।

কিন্তু রামকৃষ্ণই বলিয়াছেন, ইহা বড় কঠিন। গীতার আদর্শ অনুযায়ী কেহ সংসারী হইয়াছে বলিয়া ত এ-পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই—আদর্শটি শুধু পুঁথিতেই আছে, কার্য্যতঃ যাহারাই অধ্যাত্ম সাধনায় ব্রতী হইয়াছে তাহারাই শেষ পর্য্যন্ত সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছে—রামকৃষ্ণের প্রিয়তম শিষ্য বিবেকানন্দই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ মানুষ এখন বিবর্ত্তনের যে-স্তরে রহিয়াছে তাহাতে গীতার আদর্শ কার্য্যে পরিণত করা, ভিতরে অধ্যাত্ম চৈতন্য লইয়া সংসারে থাকা, সংসারের কর্ম্ম করা একপ্রকার অসম্ভব। এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান এতদিনে দিয়াছেন শ্রীঅরবিন্দ—মানুষকে বিবর্ত্তনধারায় আর এক স্তর উপরে উঠিতে হইবে, তবেই মানুষ অহংভাব হইতে মুক্ত হইয়া দিব্যভাবে সংসার

করিতে পারিবে—এবং মানুষকে সেই উচ্চ স্তরে তুলিয়া দিবার জন্য প্রয়োজন হইতেছে পৃথিবীতে এক অভিনব ভাগবত শক্তির অবতরণ—শ্রীঅরবিন্দ সেই শক্তির নাম দিয়াছেন Supramental Power, এবং যে সাধনার দ্বারা এই মহতী শক্তির অবতরণ সুসিদ্ধ হইবে তাহাই শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ।

অতএব গতানুগতিক ধর্ম্মাচরণের দ্বারা মানবজাতির সমস্যার সমাধান হইবে না, চাই একান্তভাবে যোগসাধনা। সকল মানুষই এরূপ যোগসাধনার জন্য সমর্থ নহে, প্রস্তুত নহে—ধর্ম্মজীবন ঠিকমত যাপন করিলে মানুষ যোগসাধনার জন্য ক্রমশঃ প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু অন্ধ গোঁড়ামিকেই ধর্ম্ম বলিয়া ধরিয়া থাকিলে, তাহার দ্বারা উন্নতি না হইয়া অবনতিই হইবে। অতএব যাহারা জড়-বাদী ও নাস্তিক তাহারা ধর্ম্মের অন্ধ গোঁড়ামিকে আক্রমণ করিয়া ভাল কাজই করিয়াছেন এবং করিতেছেন। যাহারা খাঁটি নাস্তিক তাহারা একদিন সত্যকে ধরিবেই এমন আশা করা যাইতে পারে—কিন্তু ধর্ম্মাভিমানের দ্বারা যাহারা মিথ্যাকেই সত্য বলিয়া ধরিয়া আছে তাহাদের পক্ষে প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবন লাভ করা অনেক বেশী কঠিন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঠিকমত অনুষ্ঠিত হইলে লৌকিক

ধর্ম্ম মানুষের মন প্রাণকে অধ্যাত্ম সাধনার জন্য কতকটা প্রস্তুত করিতে পারে—অতএব মানবসমাজে ধর্ম্মের স্থান রাখিতেই হইবে, তবে দেখিতে হইবে তাহা যেন কতকগুলি গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বোঝা না হয়। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের মনবুদ্ধিকে যে-ভাবে সজাগ ও শিক্ষিত করিয়া দিয়াছে তাহাতে ধর্ম্মের মূল সত্য কি তাহা ধরা মানুষের পক্ষে আর কঠিন হইবে না—অতএব মার্ক্সের পদানুসরণে ধর্ম্মকে একেবারে উড়াইয়া দিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া তাহার গ্লানিগুলি দূর করিবার চেষ্টাই যুক্তিসঙ্গত। আর এই কথাটা মনে রাখিতে হইবে—ধর্ম্ম কেবল একটা প্রাথমিক ব্যাপার, বহিরঙ্গ। কে ভগবানকে কি নামে ডাকিবে, মন্দিরে যাইবে না মস্‌জিদে যাইবে—ইহা লইয়া বিবাদ করা নিতান্ত মূর্খতা। যাহার প্রকৃতি যেমন, প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য যেমন—সে সেইভাবেই ভগবানের উপাসনা করুক, এ-সব বিষয়ে কাহাকেও বাধা দেওয়া বা কাহারও উপর বলপ্রয়োগ করা ঠিক নহে—আর ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠানসকল লইয়া বিবাদ করাও আর মানুষের পক্ষে শোভা পায় না।

ইহারই মধ্যে এমন অনেক লোককেই পাওয়া যাইবে যাহারা শুধু গতানুগতিক ধর্ম্মাচরণ ও প্রাথমিক অভ্যাস

লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে চাহে না—যাহারা সাক্ষাৎভাবে ভগবানকে চায় এবং ভগবানের বাণী শুনিয়াই জীবন সমস্যার সমাধান করিতে চায়—কবি তাহাদেরই মর্ম্মবাণী প্রকাশ করিয়াছেন,

তোমার কাছে সাধ এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
শতজনে আমায় সাধে শতবাদ
কতজনার কত বুলি হে!

যাহাদের ভিতর এইরূপ অভীপ্সা ও ব্যাকুলতা জাগিয়াছে তাহারা যাহাতে অধ্যাত্ম সাধনার সকল সুযোগ পায় তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়াই হইবে উন্নততর মানব-সমাজের প্রধানতম কর্ত্তব্য, কারণ এইসব সাধকের সাধনার ভিতর দিয়াই পৃথিবীতে ভাগবত শক্তির অবতরণের পথ সুগম হইবে, তাহারাই অগ্রগামী হইয়া সমগ্র মানব-জাতিকে নিশ্চিতভাবে অমৃতত্বের দিকে লইয়া যাইতে পারিবে।
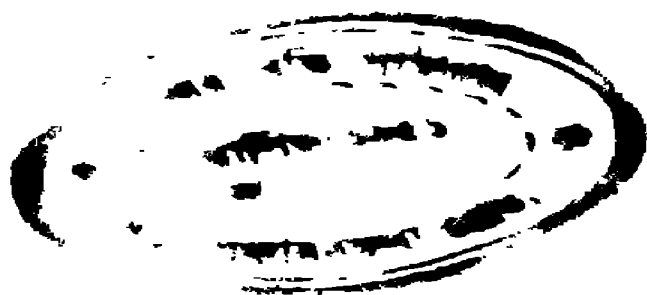
গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—

শ্রীঅরবিন্দের দিব্য ব্যাখ্যা অবলম্বনে গীতার অভিনব বিরাট সংস্করণ। ইতিমধ্যেই নয়খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য প্রতি খণ্ড ১৲ টাকা মাত্র।

"আমরা বর্ত্তমান যুগের গীতার এই শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা পাঠ করিতে সকলকে অনুরোধ করি।"

—The Teachers' Journal

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—

(সংক্ষিপ্ত) এক খণ্ডেই সম্পূর্ণ। দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ।

"শ্রীঅরবিন্দের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা অনুসরণ করিলে হিন্দু সমাজ নূতন শক্তিলাভ করিবে, তাহার সমস্ত বন্ধন খসিয়া যাইবে এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় জগতের পুরোহিতরূপে বা শান্তির দূতরূপে এই অশান্ত জগতে শান্তির বাণী আনয়ন করিতে সমর্থ হইবে।"

—শিক্ষা ও সাহিত্য

যোগ দীক্ষা (যোগ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের পত্র) ১৲
শ্রীঅরবিন্দ ও ভাবী সমাজ ... ।/০
শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ ... ১৲

The World Crisis :

Sri Aurobindo's Vision of the Future

Price Rs 1/12 only

Songs from the Soul ... **Rs 2**

The Message of the Gita ... **Rs 10**

The Gita ... **Rs 3/12**

শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজী হইতে অনূদিতঃ—

শ্রীঅরবিন্দের গীতা (Essays on the Gita)

১ম খণ্ড—১৷৷০, ২য় খণ্ড—২৸০, ৩য় খণ্ড (যন্ত্রস্থ), ৪র্থ খণ্ড —১৷৷০, শেষ ৫ম খণ্ড (যন্ত্রস্থ)।

যোগ সাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য ... ৸০
উত্তরপাড়া অভিভাষণ ... ।/০
সাধন-সূত্র ... ৶০